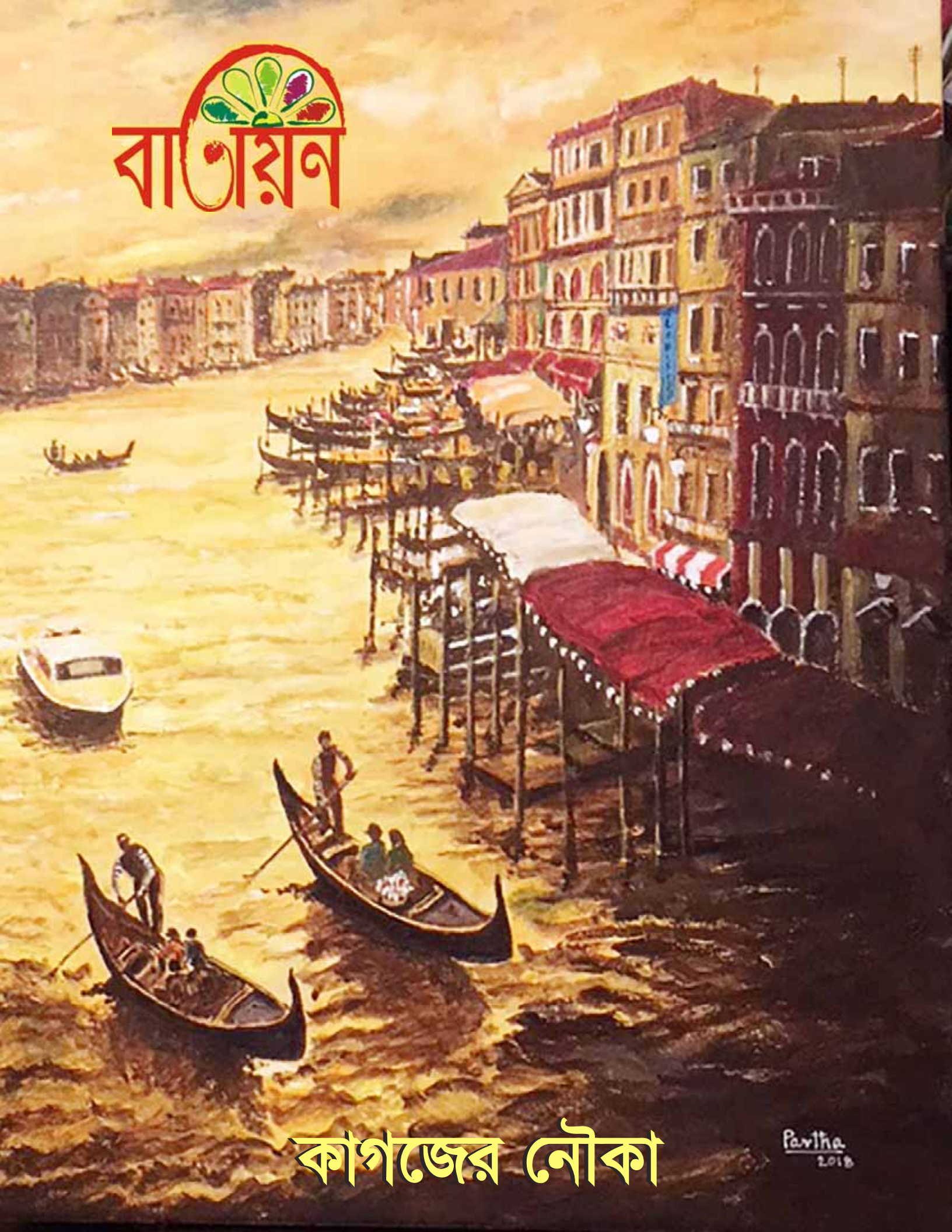

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

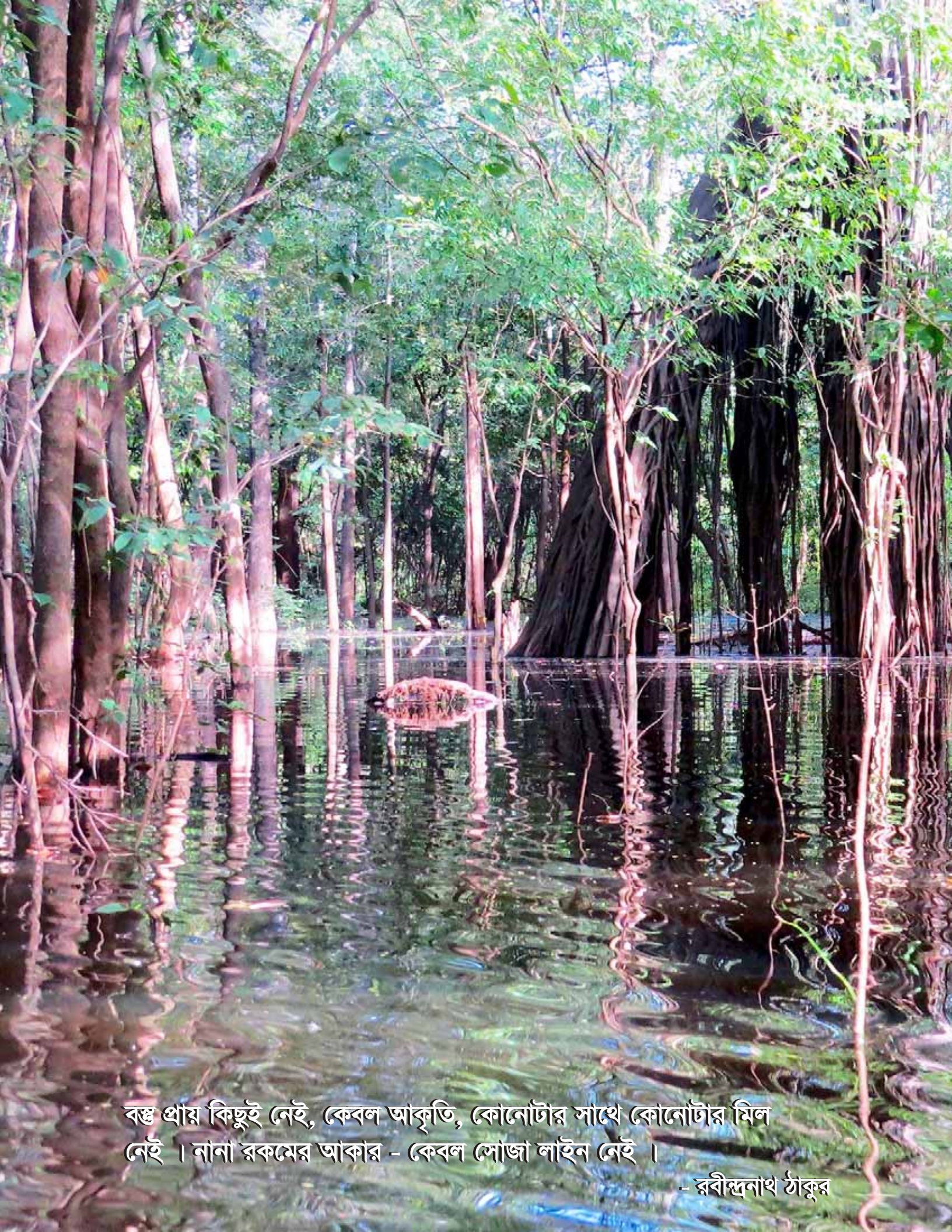

বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সাথে কোনোটার মিল নেই । নানা রকমের আকার - কেবল সোজা লাইন নেই ।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

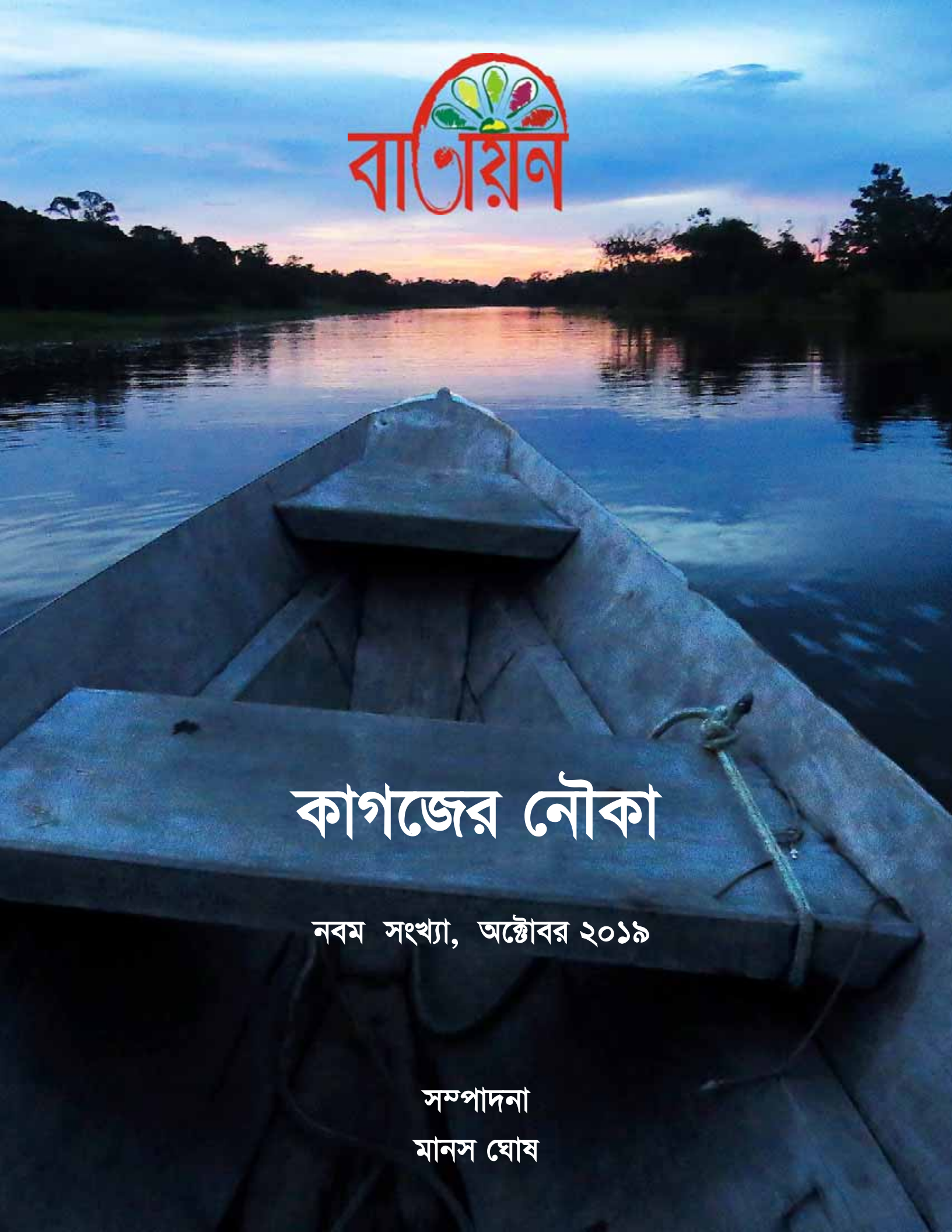

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

নবম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৯

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 9 : October 2019

Editor
Manas Ghosh, Kolkata, India

Editorial Team
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

Coordinator
Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication
Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support
Susanta Nandi, India

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Partha Pratim Ghosh **Venice Painting : Front Cover**

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

Atanu Biswas, IL, USA **Inside Front Cover & Title Page**

He is a scientist by profession who came to USA from Kolkata in 1980. However, more people know him as the face of Biswas Records, which he founded in 1994. In recognition of Biswas Record's contribution to Bengali music, the North American Bengali Conference (NABC) twice awarded Dr. Atanu Biswas its highest award at San Francisco Bay Area (1999) and at Detroit (2007). He is embracing photography as his hobby and constantly aiming to develop the photography skill.

Milan Bhattacharjee **'El Ateneo' in Buenos Aires : Inside Back Cover**

He is the President of Bongo Sanskriti Australia (a registered cultural organisation in Canberra, Australia).
Dr Bhattacharjee has a diverse and wide experience in teaching, scientific research and administration in India and Australia.

Three weeks ago I had the opportunity to visit " El Ateneo" in Buenos Aires (Argentina). This building used to be a Theatre called " Teatro Gran Splendid " and still retains the feeling of a grand theatre it was once and in 1929 had showed the first sound films presented in Argentina. The Director of this Shop informed me that several million overseas book readers visit the bookshop annually.

Rohini Nandi **Back Cover**

Rohini is 14 years and she has very much interest in various artcraft activities specially in Drawing, Paper Cutting etc. She has also keen interest in playing Guitar and loves to play Table Tennis.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

যেদিকেই তাকাই শুধু পুজো, পুজো এবং পুজো ! গত কয়েকদিন ধরে দেশে প্রবাসে বাঙালী মেতে উঠেছিল দুর্গোৎসবের আনন্দে। এই আনন্দের প্লাবনে যেন সাময়িকভাবে ঢাকা পড়ে যায় মানুষের ছোটখাট চাওয়া পাওয়ার হিসেব, ব্যথা, বেদনা হতাশা ! বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা প্রবাসী বঙ্গসমাজও মেতে উঠেছিল এই আনন্দে। কলকাতা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া, সিডনী থেকে শিকাগো, ঘড়ির সময় আলাদা আলাদা, কিন্তু মাতৃমূর্তির আরাধনার আলোয় একইরকম উজ্জ্বল সামাজিক মেলবন্ধনের এই উৎসব । মহালয়া থেকে বিজয়াদশমী, লক্ষ্মীপূজা থেকে দীপাবলি বাতায়নের কাগজের নৌকাও সমানে ভেসে চলেছে আপনাদের পাশে পাশে, সবাইকে জানাই আলোকময় শারদ শুভেচ্ছা !

এদিকে ২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে সূচনা হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উদযাপন। এই দুর্দিনে নতুন করে স্মরণ করা দরকার হয়ে পড়েছে তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টার কথা, শিক্ষা, বিশেষত নারীশিক্ষার জন্য তাঁর অবদানের কথা। আর আমরা, যারা বাংলাভাষাটাকে ভালোবাসি, বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী তারা বিদ্যাসাগরের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি বাংলা লিপির সংস্কার করে এই আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন, তাঁর লেখা বর্ণ-পরিচয় পড়েই বাংলা শেখার শুরু, শুধু তাই নয়, গদ্যে বাংলা লেখা শুরু হয় তাঁর হাত ধরেই ! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই ছিলেন 'বাংলা গদ্যের জনক।'

আপনাদের আগ্রহ ও শুভেচ্ছায় এগিয়ে চলেছে কাগজের নৌকা। ধারাবাহিকগুলি নতুনতর সম্ভাবনা নিয়ে দিনদিন আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। এছাড়াও আছে কিছু দুর্দান্ত গল্প, কবিতা, শুরু হচ্ছে নতুন ভ্রমণ আলেখ্য 'বেনারস দর্শন' ।

প্রাক্তন ভারতীয় সৈনিকের লেখা আত্মজীবনী এমনিতেই বিরল, বাংলায় সম্ভবত এই প্রথম। 'উলুখাগড়ার দিনলিপি' এই সংখ্যা থেকে কাগজের নৌকার বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে ।

দীপাবলী উৎসবের আলোয় ঘুচে যাক মানবমনের যাবতীয় অজ্ঞতা, মলিনতার অন্ধকার। সত্য ও সুন্দরের আতশবাজিতে রঙিন হয়ে উঠুক এ ভুবনডাঙার আকাশ !

সবাই ভালো থাকবেন ! আজ আসি, আপনারা পড়তে শুরু করুন ... কাগজের নৌকা।

মানস ঘোষ
সম্পাদক /কাগজের নৌকা

প্রণাম

সদাহাস্যময় এক উজ্জ্বল তরুণী যেন মঞ্চের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন ... হাসতে হাসতে, হাত নাড়তে নাড়তে মিলিয়ে গেলেন মঞ্চের অন্যদিকে, উইংসের ধার ঘেঁষে ... যিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় ক্যান্সারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লিখতে পারেন – "... ভেবেছ আমি ভয় পাবো ? ওসব তো আমার কাছে তুচ্ছ ! আই ডোন্ট কেয়ার কানাকড়ি – জানিস, আমি স্যান্ডো করি !" ... সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন, নিজে কবি পরিচয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করলেও গল্প, উপন্যাস রম্যরচনা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, অনুবাদ, ছোটদের জন্য লেখা – সাহিত্যের প্রতিটা ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ, তাঁর অলৌকিক গদ্যশৈলী (ওনার লেখা সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ) ... সবকিছু মিলিয়েই তিনি ছিলেন অনন্যা । প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের পাঠক ছিল তাঁর গুণমুগ্ধ । তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক নবনীতাকে পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ রচনায়, সেখানেও তিনি অসাধারণ এবং পথপ্রদর্শক ! কবি যশোধরা রায়চৌধুরীর ভাষায় বলতে হয় – "বুদ্ধি-যুক্তি-মেধার করাত দিয়ে যিনি কেটে ফেলতেন অন্ধকারকে ... আমরা আরো একবার নিরাপত্তাহীন হলাম ।"

তিনি বলেছিলেন, আমার যা কিছু কাজ, তা যেন মানুষের ভালোর জন্য হয় ... সত্যিই আজীবন তিনি ছিলেন যুক্তি ও শুভবুদ্ধির পক্ষে ।

এই স্বল্প পরিসরে তাঁর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে গেলে কিছুই বলা যাবেনা ... তাই এ আলোচনা তোলা থাক পরবর্তী বাতায়ন সংখ্যার জন্য ।

দুঃসংবাদটা পাওয়ার পর মনে হয়েছিল, সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, একদিনের জন্য স্থগিতও করা হল কাগজের নৌকার প্রকাশ ... মনে হচ্ছে বড্ড ভুল হয়ে গেল, এক্ষুণি হয়তো নবনীতাদি তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে বলে উঠবেন ... "এতো শোক কিসের ! ... তোমরা তো দেখছি ভুল বিসর্জনের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছো !"

তাই আজ আর নয় ।

আমরা বিশ্বাস করি, চিরনবীন নবনীতা চিরকালীন হয়ে থাকবেন পাঠকের হৃদয়ে ।

মানস ঘোষ
(সম্পাদক / কাগজের নৌকা)

সূচীপত্র

কবিতা

পল্লববরন পাল	সনেটগুচ্ছ	6
সঞ্জয় চক্রবর্তী	ছয় ঋতুতে তুমি	7

গল্প

মমতা দাস (ভট্টাচার্য)	খেলা	20
শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	বিসুখ	22

ধারাবাহিক গল্প

রমা জোয়ারদার	চা-ঘর	17

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু	হটাবাহার	8
সৌমিত্র চক্রবর্তী	সময়	31

স্মৃতিচারণ

প্রশান্ত চ্যাটার্জী	উলুখাগড়ার দিনলিপি – অন্নসংস্থানের প্রয়োজনে	36

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল	খাওয়ানো	33

ভ্রমণ

মৌসুমী রায়	বেনারসের ডায়রি	41

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ১৮

গ্রাম আর শহরের মাঝখানে থাকো
মাটি আর কংক্রিট, বুক আর মাথা
ঘর ও অট্টালিকা, সুর আর কথা
মাঝখানে তুমি পালি মিলনের সাঁকো
শাড়ি আর সালোয়ার, আংটি ও চিক
উপেক্ষা মার্জনা, বিরহ সোহাগ
আলাহিয়া বিলাবল এবং বেহাগ
তুমি সেতু স্বজনতা পারস্পরিক ।
যুযুধান দুই প্রতিপক্ষের মাঝে
দাঁড়িয়েছো সম্প্রতি আকাশপাঁচিল
যুদ্ধ না, আপামর শান্তির কাজে
তুমি সেতুবন্ধনী কবিতার মিল

তুমি তো মধ্যমণি সকলের, তবে
কবিতা-আমার মাঝে স্থিত হবে কবে ?

সনেট ১৯

ভালোবাসা মানে জানো ? যৌথ কবিতা –
একলা; যায়না লেখা – পৃথিবীতে কোনো
কবিতা একলা কেউ লেখেনি কখনো ।
কবিতার মূল কথা সত্যবাদিতা –
প্রেমের চেয়েও বড়ো সত্য আছে নাকি ?
পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কবিতা সংগ্রহ
জন্ম নেয় মরে যায় নিত্য অহরহ –
শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য অপেক্ষায় থাকি –
যেমন ঠাকুরাসন চিলেকোঠাঘরে
পিঁপড়েমিছিল রোজ অপেক্ষা করে
বাতাসার, তেমনি এ মানবসমাজ
শ্রেষ্ঠ প্রেমের জন্য অপেক্ষায় আজ ।

এসো পালি আমাদের যৌথ প্রণয়
শ্রেষ্ঠ কবিতা হোক ত্রিভুবনময় ।

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্সালটেন্সি কোম্পানির চিফ্ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি – প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ – যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস – একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা । গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা – খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

ছয় ঋতুতে তুমি

কোন উপশমে পারবো যে হতে থিতু?
তোমাকে চাওয়ার অসুখ, সে জমে আছে ।
চলে যায় আর ফেরে মৌসুমি ঋতু ।
পাবো কি জানি না এ ওষুধ তার কাছে ?

বৈশাখী দিনে তোমাকেই ভুলে গিয়ে
কিভাবে বাঁচবো ? ফুটিফাটা হয়ে বাঁচে
জ্যৈষ্ঠের দাহে মন, কাছে পেতে চেয়ে
নিঃশেষ হওয়া সেই দহনের কাছে ।

ঘোর আষাঢ়িয়া বর্ষা শেষেতে নামে,
এলোমেলো মেঘে শহরের পথ বেয়ে ।
শ্রাবণে শ্রাবণে মেঘ বৃষ্টির খামে,
ডাক পাঠিয়েছি, ভিজেছি তোমায় চেয়ে ।

নীলাভ ভাদ্রে মেঘ ফের পরিযায়ী,
দাগে কাশফুল অশ্বিনী সাদা ছোপে ।
বোধন, অঞ্জলি, ভাসানেতে একলাই
খুঁজেছি তোমায়, ভীড়ে মাখা মন্ডপে ।

ময়দানে ট্রাম চলে গেলে আলগোছে,
অঘ্রান ভোরে আমার শহরও একা ।
হৈমন্তিক তানে সঙ্গতা বুঝে
শিশির সকালে যদি হতো ফের দেখা ?

ঝরা পাতা দিন, ফেরে তিরতির সুখের,
হিম চাদরেতে শিরশিরে রাত্তিরে ।
পাইনি যে আজো উপশম এ অসুখের ।
তোমাকে চাওয়ার চাওয়ারা ফেলেছে ঘিরে ।

কৃষ্ণচুড়ার ফাগুন পেরিয়ে এসে,
অসুখী চৈত্র, নাছোড় বসন্তেরা ।
বুকের কোথাও দাগ রেখে যায় শেষে,
অবুঝ প্রেমের গুটিবসন্তেরা ।।

সঞ্জয় চক্রবর্তী অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু

হটাবাহার

পর্ব ৯

(১৫)

ধূসর মেঘে ঢেকে রয়েছে আকাশ। জলো হাওয়ার সঙ্গেই ফিসফিস বৃষ্টি হয়ে চলেছে। স্যাঁতানো, আলো নিবে আসা দিন। তিনতলা বারান্দার এপাশটায় বৃষ্টির ছাট আসছে না বলে, রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সুদীপা। একটু তফাতেই কদম গাছের ডাল। হলুদ রঙের গোল গোল ফুল ধরেছে। একটা মিষ্টি মৃদু গন্ধও ভেসে আসছে। পড়ন্ত দুপুর এখন।

সুদীপা বুঝতে পারছিলেন . . . কোথায় যেন একটা আশংকা মেশানো ধারাবাহিক অস্থিরতার শিকার হয়ে রয়েছেন তিনি। অথচ পাঁচ-ছদিন আগে যখন তাঁর আসল মামলাটির নিস্পত্তি হয়ে গেল এবং রায় গেল তাঁরই পক্ষে . . . অর্থাৎ তিনি কেস-এ জিতে গেলেন, তখন ভেবেছিলেন, যাক, . . . শত ভোগান্তি হলেও . . . একেবারে সবকিছু এখনও শেষ হয়ে যায় নি। বারবার মনে এসেছিল নিজের দুর্ভাগ্যের কথা; হৃদয়হীন, পাষন্ড তথাকথিত আত্মজনদের আগ্রাসী লোভের বিষয়, অমানুষিক উদ্বেগ আর দেশে-বিদেশে টানাপোড়েনেরও বিষয় মনে এসেছিল . . . কিন্তু স্বস্তিও অনুভূত হয়েছিল, এই ভেবে যে, আইন-আদালত সবকিছু ওরা কিনে নিতে পারে নি।

কোথাও একটা সূক্ষ্ম মানসিক প্রস্তুতিও জাল বুনতে শুরু করেছিল।

দোতালাটি এইবার তিনি সময় নিয়ে নিজের মতো ঢেলে সাজিয়ে নেবেন। প্রীতিলতাকেও বলবেন তাঁর সঙ্গেই এসে থাকতে। বছরে কয়েক সপ্তাহ তিনি সান্ডারল্যান্ডে গিয়ে থাকলে, মা ইচ্ছে করলে তিনতলায় কিংবা রূপার কাছেও থাকতে পারেন। একতলায় যা-ইচ্ছে ওরা করুক। মুখদর্শনও করবেন না কোনোদিন। একটা আলাদা যাতায়াতের পথও তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে।

আর কখনও যদি সেরকম মনে হয় . . . কিংবা পরিস্থিতির বদল হয়, নিজের অংশ বিক্রি করে দিয়ে . . . এই লেকগার্ডেন্স কিংবা গলফ্‌গার্ডেনস — এই ফ্ল্যাট কেনার ভাবনা তো ভাবা যেতেই পারে।

নাহ্ . . . কোনো ভাবনাই আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি।

বিকেলের মধ্যে সেদিন কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। ভার লাঘব হওয়ার একটা অনুভব ছিল তো বটেই। এও জানা ছিল যে, আট-দশদিন আগে থেকেই অপুরা আর দোতালায় থাকছিল না। কিছু কিছু জিনিসও সরাচ্ছিল বোধহয় একটু একটু করে। সম্ভবত ওরা সোনাদির সঙ্গে সন্তোষপুরে কিংবা কস্‌বা-র ফ্ল্যাটে থাকছিল। সুতরাং কোর্ট-অর্ডারের কপি দেখিয়েই এবার নিশ্চিন্তে তিনি দোতালায় ঢুকবেন। হয়তো ওরা আগে থাকতেই হেরে যাওয়ার আঁচ পেয়ে . . .।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে-উঠতেই, দোতালার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেলেন সুদীপা। দেখলেন, ঢোকার মুখে দরজার বাইরে যে কোলাপসিবল্ গেট, সেখানে অন্তত গোটা ছ-সাত ইয়া বড় বড় তালা ঝুলছে, এবং তাছাড়াও গোটা তিনেক চেন-এর বাঁধুনি। অর্থাৎ দোতালায় ঢুকতে গেলে অপুদের বাধ্য করতে হবে সমস্ত তালা, চেন ইত্যাদি খোলার জন্য। নয়তো . . .।

সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত বোধ করে সুদীপা তাকিয়েছিলেন সঙ্গে আসা মাইতির দিকে। কী ব্যাপার বলো তো ? এটা তো খেয়াল করিনি আগে। ঈষৎ চিন্তাচ্ছন্ন মাইতিও বোধহয়। প্যাসেজের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে বলেছিল, তাইতো . . . দেখে তো মনে হচ্ছে, আজকের না . . . কয়েকদিন আগেই ব্যবস্থা করে গেছে . . . আপনাদের চোখে পড়ে নি !

পড়লে তো বলতামই তোমাদের . . . অবশ্য আমি ছাড়া আর কারই বা ওদিকে নজর যাবে ! ওরাও নেই বেশ কদিন ধরে । কথাটা বলতে-বলতেই সুদীপা এগিয়ে গিয়েছিলেন দরজার কাছে । ভাল করে দেখে বলেছিলেন, বাব্বা এ-যে সাংঘাতিকভাবে আটকে রেখে গেছে . . . কী হবে বলো তো মাইতি ?

কী আর হবে . . . ওকে ধরে আনতে হবে . . . আনিয়ে তালা খোলাতে হবে ।

সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি . . . কিন্তু সেটা কতখানি দুরূহ কাজ ভাবতে পারছো !

মাইতি মাথা নেড়ে বলল, তা নয়তো অলটারনেটিভ হচ্ছে কোলাপসিবল্ গেট, দরজা . . . সব ভেঙ্গে ফেলা . . . ।

তাও কি খুব সহজ ব্যাপার মাইতি !

ঢুকতে গেলে একটা কিছু তো করতে হবে দীপাদি । তালা কাটার মিস্ত্রি পাওয়া যায় কিনা . . . দেখি, খোঁজ লাগাচ্ছি . . . । এখন আগে চলুন তো ওপরে . . . সুসংবাদটা মাসিমাকে দিন . . . ।

শ্লথ পায়ে সিঁড়ি ভেঙ্গেছিলেন সুদীপা । সুসংবাদ কিংবা নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনোরকম তুষ্টিই আর ছিল না । চোখেমুখে জল দিয়ে এসে চা খেতে খেতে মনে হয়েছিল, যেটুকু ভারমুক্ত হওয়ার অনুভূতি টের পেয়েছিলেন, তা উবে গেছে । দোতালায় নিজের অংশেই তালা খুলে অথবা ভেঙ্গে ঢোকার বাস্তব চেহারাটা কল্পনা করতে করতেই কেমন যেন পড়ে যাচ্ছিলেন । অতগুলো তালা . . . চেন ইত্যাদি ভেঙ্গে বা কেটে ভেতরে ঢোকা . . . ব্যাপারটা যে মোটেও সহজ না . . . বরং বেশ রীতিমত এক ধুন্ধুমার কান্ড, তা সহজেই অনুমেয় । এবং ওই ভাঙ্গাভাঙ্গি-শব্দাশব্দির ঘটনা পাড়ার এবং রাস্তার লোকের কৌতুহল আকর্ষণ করবে . . . তখন যত ব্যবস্থাই গ্রহণ করা যাক কৌতুহলই মানুষকে টেনে নিয়ে আসবে . . . ভিড় হয়ে যাবে . . . হৈচৈ হবে . . . স্থানীয় মস্তান-রকবাজ-রংবাজরা এসে হাজির হবে . . . তাদের মধ্যে অপুদের চেলাচামুন্ডারাও থাকবে . . . তারা এক বিশাল গন্ডগোল বাধিয়ে তুলতে পারে . . . বাড়িতে বোমা পড়তে পারে . . . ইটপাটকেল ছুঁড়তে পারে . . . তারপর পুলিশ আসবে . . . জানলা-দরজার কাঁচ ভাঙ্গবে — কেউ কেউ আহত হতে পারে . . .

সুদীপা টের পাচ্ছিলেন, কেস-এ জিতে আসার পরেও তিনি উত্তেজনায়, অস্থিরতায় ভেতরে ভেতরে ঘেমে যাচ্ছেন । আরও বুঝতে পারছিলেন অপুরা তাঁকে বিপদে ফেলার জন্য বেশ মাথা খাটিয়েই ব্যবস্থা করেছে । হয়তো ওদের লইয়ারই কিংবা কোনও শয়তান পাকা মাথা এসব পরামর্শ দিয়েছে । হাতে-পায়ে মৃদু কাঁপুনি টের পাচ্ছিলেন সুদীপা । ওপর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, অথচ দুর্ভাবনার ছায়া স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল তাঁর চোখে মুখে । বুকের মধ্যে দুরদুর ।

প্রীতিলতা ঝুম হয়ে বসেছিলেন এক কোনায় । মামলার রায় দীপার পক্ষে গেলেও, সমস্যার যে সমাধান হয় নি এবং আবার একটা অশান্তি এবং বড়রকম ঝামেলার সম্ভাবনা আছে, তা তিনি অনুমান করেছেন । এবং তাঁর নৈঃশব্দ এবং শরীরের ভাষাতে যেন একটাই বক্তব্য ফুটে উঠছে, যে এতো সব গন্ডগোলের জন্য তিনিই বুঝি দায়ী । তাঁর চোখে মুখে নৈরাশ্য । উদ্বেগ ।

চা শেষ করে এবং ফিরে যাওয়ার আগে মাইতি বলেছিল, কী হল দীপাদি . . . আপনারা সবাই মুষড়ে পড়লেন যে ।

সুদীপা চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বলেছিলেন, খুশি হওয়ার তো কোনও কারণ নেই মাইতি ।

মাইতি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, না-না সেকথা বলবেন না দীপাদি . . . কেস-এ জেতাটা কি কম রিলিফ !

সেটা আর টের পেলাম কোথায় ! তার আগেই তো আবার অগাধ জলে পড়ে গেলাম ।

স্টেপ-বাই স্টেপ সব ঠিক হবে দীপাদি ।

সুদীপা ওর দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন, এর মধ্যে যে আবার স্টেপ আছে . . . তা তো জানতাম না . . . ।

এসব ঝামেলা একবার বেধে গেলেই . . . বুঝলেন না . . . !

কিন্তু কেস করে নিজের প্রপার্টি ফিরে পেয়েও যদি ঝামেলা থেকে রেহাই না পাই . . . কিরকম লাগে বলো !

আসলে দীপাদি . . . ডিসপিউটেড প্রপার্টির গন্ডগোল একবার শুরু হলেই . . .

মাইতিকে থামিয়ে দিয়ে সুদীপা বলেছিলেন, ডিসপিউটেড প্রপার্টি ! . . . আমার বাবার নিজের উইল করে, রেজিস্ট্রি করে দিয়ে যাওয়া আমাদেরই বাড়ি, কি করে ডিসপিউটেড প্রপার্ট্রি হয় মাইতি ! এটা তুমি কী বলছো !

আপনার সেন্ট্রিমেন্টটা আমি বুঝতে পারি দীপাদি . . . কিন্তু এইসব মামলা মোকদ্দমা . . . থানা পুলিশ হওয়া মানেই তো বোঝেন — বাইরের লোকের কাছে . . . তারপর আপনি আবার বিদেশে থাকেন . . . ।

তার সঙ্গে আমার পৈতৃক সম্পত্তির কী সম্পর্ক ! ডিসপিউট-টাই বা কোথায় . . . কেন ?

হয়তো কিছু নেই . . . তাহলেও মানুষ তো গসিপ করে এসব নিয়ে . . . তিলকে তাল করে । কতরকম লোক আছে দীপাদি . . . দালাল-প্রোমোটার-ঠকবাজ-লোকাল লিডর . . . এরা তো সবসময় ধান্ধা করে বেড়াচ্ছে না . . . কোত্থেকে কী দাঁও মারা যায় . . . । কোনো ঘরবাড়ির ব্যাপারে একটু কিছু গোলমালের খবর জানলেই . . . শালারা সব তক্কে তক্কে থাকে . . . । তো যাকগে . . . আপনি এখন আর ওসব ভাববেন না . . . দেখি . . . একটা কিছু রাস্তা বার করতে হবে আবার . . . । আসি আজ ।

সুদীপা বলেছিলেন, দাঁড়াও মাইতি . . . তুমি কিরকম রাস্তার কথা ভাবছো বলো তো ?

এখনও ভাবিনি . . . তবে কিছু তো বার করতেই হবে, যাতে আপনার রিলিফ হয় . . . ।

মাইতি চলে যাওয়ার পরেও সেদিন চুপচাপ একই জায়গায় বসেছিলেন সুদীপা । মেঘলা আকাশ . . . দ্রুত সন্ধে হয়ে আসছিল । রজতাভ মারা গেছে . . . আর মাস দুয়েকের মধ্যে একবছর হয়ে যাবে । এখনও মানুষটার অনুপস্থিতি মেনে নিতে পারেন না সুদীপা, অথচ পরিস্থিতি এবং বাস্তবতা তাঁকে দিয়েই ওর মৃত্যুটাকে আরও বেশি প্রতিষ্ঠিত করিয়ে নিয়েছে এবং নিচ্ছে । সেই উদ্যোগও — দেশে সব-সময়েই তাঁর পাশে মানুষ ছিলেন — যাঁরা মৃতর পরিবারবর্গের জীবনপথ সুগম করে দিয়েছিলেন । সেটাই সভ্যতা, সামাজিকতা । তাইতেই মৃত্যুর পূর্ণচ্ছেদ অতিক্রম করে জীবন বহমান থাকে ।

অথচ সেই একই উদ্যোগের আশায় দেশে ফেরার আগে থেকেই যেন বিপর্যয় শুরু হয়েছে, মুখ থুবড়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছেন সুদীপা । তাঁর পাশে মানুষ নেই, তা তো না ! তিনি যে বিশ্বাস হারাতে চান, তাও না । তথাপি তিনি বিপর্যস্ত কেন ! কখনও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উদ্বেগের নতুন রেখা আবিষ্কার করেন সুদীপা মুখে । কয়েক মাসেই ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট টের পান ।

কিছু কি ভুল করেছেন সুদীপা জীবনে ! তিনি কি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন নিজের শিকড় ছিঁড়ে ! কখনই তো তা অনুভব করেন নি ! তবে ? সন্ধে নাগাদ আইনজীবি অপূর্বরঞ্জনের টেলিফোন পেয়েছিলেন সুদীপা । — গুড ইভনিং ম্যাডাম । কেস হয়ে যাওয়ার পরে আর কথা বলতে পারিনি । হোপ য়্যু আর হ্যাপি ।

কী বলবেন সুদীপা ! দোতালায় উদ্ভুত পরিস্থিতির বিষয় ল-ইয়ার জানেন না । ওদিকে শ্রীরামপুরের বাড়িতেও কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, তাই নিয়ে অপূর্বরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলব-বলব করেও সুযোগ হয় নি । সুতরাং কতটা হ্যাপি . . . কি করে বলবেন !

সামান্য দ্বিধা জড়িয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ . . . হ্যাপিই তো হওয়ার কথা মিস্টার মল্লিক ।

'কথাটার' জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ম্যাডাম । বহু আর্গুমেন্টস্ . . . ।

তাই নাকি ! আমরা শুনতে পাইনি দূর থেকে।

কালকে তিনটের পরে চেম্বারে আসুন . . . শোনাব।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই . . . এমনিতেও তো আপনার . . . ।

সে ঠিক আছে ম্যাডাম . . . কিন্তু আপনার গলায় খুশির ঝলকটা তো তেমন টের পাচ্ছি না . . . !

সুদীপা বলেছিলেন, ঠিকই ধরেছেন . . . আপনার একটু সময় আছে . . . মানে কথা শোনার ?

বলুন না . . . সময় তো করেই নিতে হয় . . . বলুন।

খুব বেশি বিস্তারিত না করে নতুন পরিস্থিতি এবং নিজের মানসিকতার কথা লইয়ারকে জানিয়েছিলেন সুদীপা। একই সঙ্গে সেই-দিনই প্রথম জানিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ির জটিল পরিস্থিতির কথাও। নিজের অস্থিরতা এবং কোথায় যেন একটু নিরাপত্তাবোধের অভাবের কথাও সেইদিনই প্রথম জানিয়েছিলেন অপূর্বরঞ্জনকে। কেস-এ জিতেও বাড়িতে ঢুকতে না পারার যে হতাশা, ব্যর্থতার অনুভব, সে কথা বলেছিলেন। বুঝেছিলেন, অপূর্ব বেশ মনযোগ সহকারেই তাঁর কথাগুলো শুনেছিলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু মন্তব্য করেন নি, শুধু হুঁ-হাঁ করেছিলেন।

কথা শেষ হওয়ার আগে অপূর্বরঞ্জন শুধু বলেছিলেন, ঠিক আছে ম্যাডাম . . . মোটামুটি সবটাই তো শুনে নিলাম . . . আজ রাতের মধ্যে ডিক্টাফোনে একটা নোট-ও করে রাখছি . . . । আসলে আপনার তো এতো কেস . . . ।

সুদীপা বলেছিলেন, আসলটা তো মিটে গেল।

কিন্তু অন্যগুলোও তো মেটাতে হবে . . . আবার তারমধ্যেই তো দেখছেন . . . বেশ গুছিয়ে নতুন বাঁশ খাড়া করে দিয়েছে . . . । এদিকে দেখতে হবে, ওরা আবার হায়ারকোর্টে যাওয়ার চেষ্টা করছে কি না !

কিন্তু জাজ্ তো তাঁর রায়ে হাইকোর্টে যাওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন শুনলাম !

তারজন্যও আবার পিটিশন করা যায় ম্যাডাম . . . ।

সুদীপা আর না বলে পারেন নি, তাহলে এই মামলা-মোকদ্দমা তো কোনদিন শেষ হবে না মিস্টার মল্লিক।

শেষ তো হয় না ম্যাডাম . . . শেষ করতে হয়।

আমি খুব ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি।

আমরা তো আছি ম্যাডাম . . . কাল আসুন . . . কথা বলব। . . .

নাহ্ . . . পরের দিনও যে তেমন কিছু নিশ্চিন্তি আর তুষ্টি নিয়ে সুদীপা ফিরেছিলেন তা নয়। মাইতির হিসেব করে দেওয়া অনুযায়ী সব মিলিয়ে সেদিনই পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন অপূর্বরঞ্জনকে। ভদ্রলোক আবার নিজের হাতে টাকা নেন না। সামন্ত নিয়ে গুছিয়ে রাখে। তবে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছিলেন। আর শুনতে শুনতে সুদীপার সূক্ষ্মভাবে মনে হয়েছিল, অপূর্বরঞ্জন — ওকি প্রচ্ছন্নভাবে কিছু একটা ইঙ্গিত দিতে চাইছেন ! বিপদে পড়ার ইংগিত ! সুদীপার ঝামেলায় পড়ার ইংগিত !

দু-একদিন ধরে মাইতিও যেন বলার চেষ্টা করছে — এসব ঝামেলা কি সহজে মেটে . . . কোথাকার জল কোথায় গড়ায় . . . ! একটা-একটা করে দিন চলে যাচ্ছে। সুদীপা টের পাচ্ছিলেন, কেস-এ জিতেও অতগুলো তালাবন্দী হয়ে দোতালাটা পড়ে রয়েছে — তাঁর কিছুতে সহ্য হচ্ছে না। অথচ খোলার ব্যবস্থা কিংবা সুরাহা কিছু হচ্ছে না।

কোর্ট-এর রায় তাঁর হাতে এসেছে। তাইতে পরিষ্কার লেখা আছে, বাড়ির দোতালার একমাত্র মালিক বা মালিকানি শ্রীমতী সুদীপা রায় এবং অন্য যে কোনো কেউ তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া ওই অংশ দখল করে থাকলে, তা হবে বেআইনি কাজ এবং সে বা তারা হবে আইনের চোখে অপরাধী।

সবই তো বলা আছে। তাসত্বেও সুদীপা যে নিজের বাড়িতে ঢুকতে পারছেন না . . . সেটা তাহলে কে দেখবে ! হঠাৎ তাঁর নিজেরই মাথায় এসেছিল, ঠিকই তো, এক্ষেত্রে পুলিশকে জানানোই তো ঠিক। ঘরে-বাইরে যে কোনো ব্যাপারে আপোষ-মীমাংসায় যদি কাজ না হয়, সেক্ষেত্রে আইন এবং ধারক-বাহকই তা মেটাবে। এবং সেই ধারক-বাহক হচ্ছে পুলিশ। তারাই এসে দেখুক এবং ব্যবস্থা করে দিক সুদীপার নিজের ঘরে ঢোকার।

কিন্তু তার আগে পুরো ঘটনা জানাতে হবে পুলিশকে এবং দরখাস্তও করতে হবে। সঙ্গে কোর্টের রায় এবং মালিকানা পত্রের প্রমাণ-এর কপিও দিতে হবে। সবই পাঠিয়েছেন সুদীপা। থানার ওসির সঙ্গে সাক্ষাতের এ্যাপয়েন্টমেন্টও পেয়েছেন বিকেল চারটেয়। আর একটু পরে বেরুবেন সুদীপা। থানা এমনকিছু দূরে না। গাড়ি নেই, ট্যাক্সি করে যাওয়া যাবে।

দিবানিদ্রা ভঙ্গ করে প্রীতিলতা এসে দাঁড়িয়েছেন মেয়ের পাশে। বেরুবি ?

বাইরের প্রকৃতির মতোই ভিজে, মেঘলা মনের অবস্থা সুদীপার। বললেন, হ্যাঁ মা . . . একবার থানায় যাব।

পুলিশ কিছু করবে তালা খোলার ব্যাপারে ?

করাই তো উচিৎ !

বড্ড খাঁই ওদের . . . অনেক টাকা ঘুষ-টুষ চাইতে পারে। তাও আবার সোজাসুজি তো বলবে না . . . !

প্রীতিলতার বাস্তববোধ বেশ টন্‌কো। সুদীপা বললেন, দেখি গিয়ে কথা তো বলি আগে . . . কী হিনট্ দেয় . . . ।

একা যাবি . . . নাকি মাইতি যাচ্ছে সঙ্গে ?

একাই যাব।

মাইতি গেলে ভাল হতো . . . ও ওইসব ঘাঁতঘোঁত ভাল বোঝে।

মাইতি কি দালালের কাজ করে ?

নানান ধান্দাতেই তো ঘোরে বলে শুনি . . . মিড্‌লম্যান-দেরই তো পোয়া বারো !

সুদীপা আবার একটু অবাক-ই হলেন মা-এর বাস্তববোধে। বললেন, তুমি এতো জানলে কোত্থেকে ?

মাঝে মাঝে আসে তো . . . গল্পো-টল্পো করে। সেইসব শুনেই মনে হয়। তাছাড়া . . . সিরিয়াল দেখলেও ওসব বোঝা যায়।

দুর্ভাবনার মধ্যেও একটু হাসি পায় সুদীপার। একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমার এসব ঝামেলা টেনশন . . . এতো গোছাগোছা খরচ . . . কবে কমবে বলো তো মা ?

আমি কি আর গুনতে পারি ! তবে ওই . . . এতো বছর বিলেতে আছিস . . . অন্যরকম চালচলনে অভ্যস্ত হয়েছিস তো . . . এদেশে তোকে সব-সময়েই খানিকটা টেনশন, অশান্তি, বিরক্তি নিয়ে চলতে হবে। আবার কত কি ভালও লাগবে . . . নিজের দেশ . . . নাড়ির টান — যে !

চারটের কিছু পরেই থানার বড়বাবু নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন সুদীপাকে।

সুদীপা ঢুকতেই বেশ দরাজ গলায় শ্যামল হালদার বললেন, আসুন মিসেস রায় . . . বসুন । পাশে আর্দালি গোছের লোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, দুধ-চিনি ছাড়া . . . টি-ব্যাগ দেওয়া চা দিতে বলো । ভিজিটর এলে যেন অপেক্ষা করে বাইরে ।

ওসি-র পরনে যথারীতি য়্যুনিফর্মহীন সাধারণ পোশাক — ট্রাউজারস-চেকসার্ট । ছোট করে ছাঁটা চুল । বর্ষাবাদলার দিন বলে সুদীপাও বেরিয়েছেন জিনস এবং টপ পরে, হাতে ফোলিও ব্যাগ । ওসি-র বড় টেবিলের উলটো দিকে প্রথমসারির চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, পাঁচ-ছ মাস আগে আমি একবার আপনার এই অফিসে . . . ।

সুদীপার কথার মধ্যেই ওসি হাত তুলে বললেন, মনে আছে . . . আপনাদের সেই মাসি-বোনপো কেস ।

সুদীপা স্পষ্ট গলায় বললেন, রিলেশনশিপটা ইম্পর্টান্ট নয় . . . একটা ঠগ, জোচ্চর লোক আমার বাড়ি দখল করে . . . মেরে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল . . . ।

আই রিমেমবার । ওসি বললেন । তারপর বোধহয় আপনাকে ফিজিক্যালিও এ্যাসল্ট করেছিল . . . ।

হ্যাঁ . . . ওর এগেনস্টে ক্রিমিন্যাল কেস হয়েছিল . . . তখনই আমি আপনার অফিসে এসেছিলাম ।

ঠিক ঠিক । সেই অপরেশ না অনিমেষ ছেলেটি ওয়াজ সাপোজড টু বি এ্যারেস্টেড . . . বাট হি ওয়াজ এ্যাবস্কন্ডেড ।

সুদীপা বললেন, তা আমি জানি না । তবে এটুকু জানি, ওর ল-ইয়ার এসে আপনার কাছে সাবেস্তার করেছিল . . . এ্যান্ড আলটি-মেটলি হি ওয়াজ গ্র্যান্টেড বেল ।

সুদীপার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ওসি বললেন, তা হতে পারে । বেল ইজ গ্র্যান্টেড বাই দ্য কোর্ট ।

সুদীপা বললেন, আমি অবশ্য ওই ব্যাপারে আপনার কাছে আসি নি ।

চা — এসে পৌঁছেছিল । প্লেটের ওপর বসানো কাগজের কাপ, তারমধ্যে গরমজল এবং টি ব্যাগ । ওসি শ্যামল হালদার সুদীপার দিকে প্লেট-চা এগিয়ে দিয়ে বললেন, অফকোর্স . . . । আপনাদের তো কোর্টকেস চলছিল ।

সুদীপা একসিপ চা খেয়ে বললেন, গত সপ্তাহে তা শেষ হয়ে গেছে ।

আয়াম শ্যিওর . . . আপনি কেস জিতেছেন । . . . বাই দ্য ওয়ে . . . আপনাদের যেন বিদেশে কী একটা মিসহ্যাপ হয়েছিল . . . ।

হ্যাঁ . . . গত সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যান্ডে আমার স্বামী একটা ম্যাসিভ সেরিব্রাল হেমারেজ হয়ে মারা গেছেন . . . ।

মুখে চু-চু শব্দ করে ওসি বললেন, আয়াম সো সরি টু হিয়ার দ্যাট . . . । আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি . . . ডেফিনিটলি হি ডায়েড ইন কোয়াইট আর্লি এজ . . . ।

ওনার ছাপ্পান্ন বছর বয়েস হয়েছিল . . . ।

ওটা একটা চলে যাওয়ার বয়স হল ! ইভন দেন . . . আপনার থেকে অনেকটা বড় ছিলেন ।

নট রিয়্যালি . . . আমাদের পাঁচ-ছ বছরের তফাৎ ছিল ।

আই সি . . . আপনাকে দেখা মনে হয় না . . . । হাওএভার . . . এরমধ্যে কেসটা যে জিতেছেন . . . দ্যাট ইজ আ ব্লেসিং । সুদীপা বললেন, হ্যাঁ ইনিশিয়ালি আমিও তাই ভেবেছিলাম । কিন্তু এখন দেখছি কেস-এ জিতেও তো কিছু সুরাহা হল না . . . কেন না আমি আমার বাড়িতে ঢুকতে পারছি না । আপনার কাছে সেইজন্যই আসা . . . ।

ওসি কয়েক মুহূর্ত নীরবে মাথা দোলালেন। তারপর বললেন, আপনাকে বাধা দিচ্ছে কে ?

সেই অর্থে ফিজিক্যালি কেউ না। কিন্তু আমার ফ্লোরটায় . . . যেটা ওরা দখল করে রেখেছিল, সেখানে বিশাল বড় বড় তালা আর চেন বেঁধে রেখে গেছে কোলাপসিবল গেট আর দরজায়। ঢুকবো কি করে !

একটু ভেবে নিয়ে ওসি বললেন, ভেঙ্গে দিন . . . বাড়ি তো আপনার।

সে তো বটেই। কিন্তু ওইভাবে একটা বাড়ির গেট-এর অতগুলো তালা ভাঙ্গা . . . শব্দাশব্দি . . . লোক জমে যাওয়া-হৈচৈ . . . সব মিলিয়ে তার সোসাল ইমপ্যাক্টটা আমার ওপর কতখানি . . . আপনি যদি প্র্যাক্টিক্যালি ভাবেন . . . ।

আপনি কী চাইছেন ?

আমি ন্যাচারালি একটা গন্ডগোলের পরিস্থিতি এড়ানো এবং আমার সেফ্‌টির জন্য পুলিশের সাহায্য চাইতে এসেছি . . . আর কোনও অলটারনেটিভের কথা আমার মাথায় আসে নি।

কিন্তু পুলিশ তো আপনার বাড়ির তালা ভাঙ্গবে না। পুলিশের সে-অধিকার নেই।

জানি। কিন্তু আমরা ভাঙ্গতে গিয়ে আক্রান্ত হলে পুলিশের প্রোটেকশান চাইতে পারি না ?

আগে থাকতে কিছুই করা যাবে না ম্যাডাম . . . ঝামেলা বাধলে ফোর্স যাবে . . . ।

পুলিশ-ষ্টেশনের ইনচার্জ হিসাবে আপনাকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখলেও . . . কিছু হবে না ? আমি আপনাকে পরিস্থিতিটা ভাবতে রিকোয়েস্ট করছি . . . জাস্ট থিংক . . . পাড়ার মধ্যে একটা বাড়ির দোতালায় . . . ছেনি হাতুড়ি-লোকজন নিয়ে . . . আমি একজন মহিলা . . . হাত তুলে সুদীপাকে থামিয়ে দিলেন ওসি।

ধীরে সুস্থে বললেন, আই ক্যান ইমাজিন মিসেস্ রায়। আসলে কী জানেন . . . সুদীপাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে ভাল করে জরিপ করে ওসি বললেন, অফিসিয়ালি-লিগ্যালি অনেক কিছু করা যায় না, আবার একটা সম্পর্ক, আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে . . . এখন পুলিশকে চমকায় না এরকম লোক কম আছে . . . সে নেতা-মস্তান-রংবাজ যে-ই হোক . . . । বাট ডোন্ট মিস আন্ডারস্ট্যান্ড মি . . . ।

সুদীপা বিভ্রান্ত বোধ করলেন। ওসির দৃষ্টিতে অস্বস্তি বোধ করেই যেন একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বললেন, কিন্তু আমি ঠিক . . . বুঝতে পারলাম না . . . ।

পারবেন মিসেস্ রায় . . . য়্যু আর এ চার্মিং উমম্যান . . . ইন্টেলিজেন্ট . . . আর পুলিশ অফিসার মানেই সব ঘুষখোর দ্যাটস নট ট্রু . . . আপনাকে আমার বন্ধু মনে করতে ভালই লাগবে। উই শ্যুড হ্যাভ . . . একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর কি . . . ।

সুদীপা টের পেলেন সূক্ষ্ম কাঁপুনি উঠছে তাঁর শরীরে। নিজেকে তাসত্বেও নিয়ন্ত্রণে রেখে বললেন, কিন্তু তার সঙ্গে আমার বাড়ির তালা ভাঙ্গা . . . পোজেশন পাওয়ার কী সম্বন্ধ মিস্টার হালদার !

আছে ম্যাডাম . . . হবে . . . আমার সঙ্গে একটু মিশেই দেখুন না . . . ! কার্ডটা রাখুন . . . মোবাইলেই কল করবেন। আর হ্যাঁ . . . এখনই একটা ফরম্যাল এ্যাপ্লিকেশনও দিয়ে যান ক্লার্ক-এর কাছে . . . দ্যাট য়্যু নিড পুলিশ প্রোটেকশন ফর . . . ওকে ?

সুদীপা উঠে দাঁড়ালেন ফাইল নিয়ে। না . . . কোনও হঠকারিতার সময় নয় এখন। শুধু সহ্য।

শান্তভাবে বললেন, ওকে . . . এ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে যাচ্ছি।

সুদীপা বেরুনর মুখেই ওসি আবার বললেন, ওহ হ্যাঁ . . . একটা কথা মিসেস রায় . . . সেই যে বেঁটে মতো লোকটা আগেরবার আপনার সঙ্গে এসেছিল, আই নো হি ইজ নট ইয়োর ব্রাদার . . . যদিও আপনি বলেছিলেন . . . ।

সুদীপা বাধা দিয়ে বললেন, বলেছিলাম, কেননা . . . নিজের ভাইয়ের মতোই ও আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল ।

হোয়াটএভার . . . আপনার সঙ্গে কি এখনও কন্ট্যাক্ট আছে তার ?

কেন বলুন তো ? কিরকম কন্ট্যাক্টের কথা বলছেন ?

ওসি মাথা দুলিয়ে বললেন, ম্যাডাম . . . কিছু মনে করবেন না . . . এসব টাউটগোছের লোকগুলোকে কাছে ঘেঁসতে দেবেন না । এরা গাছেরও খায়, আবার তলা থেকেও কুড়োয় ।

সুদীপা ঈষৎ কঠিন মুখেই বললেন, আপনার এ্যাডভাইসের জন্য ধন্যবাদ । কিন্তু মাইতিকে আমি চিনি ।

হঠাৎ একটু কঠিন স্বরেই ওসি বললেন, না, চেনেন না . . . এদের চেনা এতো সহজ না ।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরেই সুদীপা থমকালেন একটু । তার মধ্যেই ওসি আবার বললেন, আয়াম সরি ম্যাডাম . . . আপনাকে কথাটা রূঢ়ভাবে বলার জন্য . . . আপনি কি আর দুমিনিট বসতে পারবেন ?

কি ভেবে সুদীপা বসলেন । মনে মনে ভাবলেন, একটু আগে লোকটা যত কুৎসিত ইংগিতই করে থাকুক, পুলিশ ষ্টেশনে, নিজের অফিসে বসে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার সাহস দেখাবে না । তাছাড়া মাইতি সম্পর্কে একটু জানার কৌতুহলও তিনি এড়াতে পারছেন না, বা চাইছেন না । জানাটা দরকার মনে হচ্ছে ।

ওসি বললেন, শুনুন ম্যাডাম . . . আপনাদের এই মাইতিরা যে কোনো প্রপার্টি সংক্রান্ত ব্যাপারের ঝামেলা সবসময় জীইয়ে রাখতে চায় . . . যাতে ওটার শেষপর্যন্ত 'ডিসপিউটেড' বলে ছাপ পড়ে যায় । ফলে তার বাজারদর অনেক কমে যায় । তখন এরাই বায়ার খোঁজে, প্রোমোটার ধরে এবং তাদের সস্তায় বাড়ি পাইয়ে দেবার টোপ দেয় । আবার মালিককে বলে, ডিসপিউটেড প্রপার্টি তো বিক্রি হবে না . . . পড়ে পড়ে ধসে যাবে, নষ্ট হবে . . . যা দাম পাবেন বরং বেচে দিন । শুনতে শুনতে আপনাদেরও একদিন মনে হবে . . . কথাটা ঠিকই বোধহয় । আর তখন এই দালালরা দুদিক থেকেই পয়সা পায়, এবং মজা হচ্ছে, তারপরেও এরা দুতরফের কাছেই প্রিয় সেজে থাকে . . . কী আর বলব ! এন. আর. আই.-দেরই এরা বেশি এক্সপ্লয়েট করে ।

সুদীপা একটু চুপ করে থেকে বললেন, আপনি আর কিছু বলবেন বড়বাবু ?

হ্যাঁ . . . আর একট কথা । আপনার ওই মাইতি যে আপনি কেস-জেতার পরেও, দু-পক্ষের উকিলকে সঙ্গে নিয়ে . . . আমার মধ্যস্থতায় ওই অপরেশ না অনিমেষের সঙ্গে আপনার কম্প্রোমাইজ করে দেওয়ার ধান্ধা করছে, বলে দেবেন, আমি সেটাতে এগ্রি করছি না ।

সুদীপা বলে উঠলেন, আমি তো এসব ব্যাপারে কিছুই জানি না . . . আপনি আমাকে বলছেন কেন ?

জানেন না — বলেই বলছি । মাইতি চায় আপনি আপনার অংশ বেচে দিন এবার এবং ওই ছেলেটা সেটা কিনুক । হিসেবটা বুঝলেন কিছু ! আর আপনাদের ওই বাড়ির দুটো ফ্লোর ওরা পেয়ে গেলে, আপনার বোন আলটিমেটলি তিনতলাটা ছেড়ে দেবেন . . . মানে বাধ্যই হবেন ছেড়ে দিতে । তারপর আপনার ফ্ল্যাট কেনার ব্যাপারেও মাইতি . . . এনিহাউ . . . বাদ দিন ।

কিন্তু এসব ডিটেল আপনিই বা জানলেন কোত্থেকে !

খোঁজ রাখতে হয় ম্যাডাম . . . মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে রাখাই যে আমাদের সামাজিক কর্তব্য । আর . . . আপনার মতো মহিলা-বন্ধুর জন্য যদি কোনো উপকারে লাগি . . . । কথাটা অন্যভাবে নেবেন না . . . আপনার জন্য আমি আছি । আপনি ডাকলেই বান্দা হাজির হয়ে যাবে . . . না . . . না . . . না . . . আপনার কোনও দায়িত্ব নেই . . . উই উইল হ্যাভ ফান . . . । . . . ফোন আশা করব কিন্তু . . . ।

সুদীপা গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে শুনলেন, ওসি বলছেন, মিসেস রায়, আপনার বাড়ির ওইসব তালা-টালা খুলে, ভেঙ্গে নিশ্চিন্তে আপনাকে ঢোকানর দায়িত্ব আমার । আপনি জাস্ট আমাকে . . . আই লাইকড্ য়্যু . . . ।

সন্ধ্যা নামার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বাইরে । রাস্তার আলো জ্বলে উঠছিল একটা-দুটো করে । থানার বাইরে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলা দিয়ে যেতে গিয়ে সুদীপার চোখে পড়ল, উল্টো দিকের ফুটপাথ থেকে ত্রস্ত পায়ে রাস্তা পার হয়ে থানার গেট-এর দিকে যাচ্ছে মাইতি । ব্যস্তভাব ওর হাঁটার মধ্যে । একেবারে অবাক হয়ে গেলেন সুদীপা । ওসি তাহলে ঠিক কথাই বলেছেন !

ফুটপাথের চা-এর দোকানের পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় নেমে, এলেন সুদীপা । মাইতিকে দেখা দিলেন না ।

(চলবে)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **নবকুমার বসু** ইংল্যান্ডের বাসিন্দা । ''চিরসখা'' সহ অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন । প্রতিভাস প্রকাশিত 'তোমার আঁধার তোমার আলো' তাঁর নবতম উপহার, গত বইমেলায় প্রকাশিত । 'হটাবাহার' তাঁর প্রথম অন্ লাইন ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনি বাতায়নের হাতে তুলে দিয়েছেন ।

ধারাবাহিক গল্প

রমা জোয়ারদার

চা-ঘর

পর্ব ৫

[পূর্ব কথা: মাধ্যমিক পরীক্ষায় খুব ভালো নম্বর নিয়ে পাশ করল রঘু। মাস্টার মশাই এবং দোকানের নিয়মিত খরিদ্দার, যারা বহুদিন ধরে রঘুকে দেখছে, সবাই খুব খুশি হয়ে রঘুকে আশীর্বাদ করল। সবাই বলল, সে যেন এবার উচ্চমাধ্যামিকের জন্য তৈরী হয়। পড়াশোনা বন্ধ না করে। রঘুর এই সাফল্যের কারণে তারা সবাই চাঁদা তুলে একটা ফিস্টির ব্যবস্থাও করে। ওদিকে রঘুর অংকের দিদিমনি, আলো রঘুকে বলে, পুরুলিয়াতে গরীব ছেলেদের জন্য একটা স্কুল আছে। চেষ্টা করলে রঘু সেখানে ভর্তি হতে পারে। ওখানে বিনা খরচে তার থাকা খাওয়া, পড়াশোনা সবই হবে। রঘু তার মতামত জানাবার আগে মাস্টারমশাই আর জিতেন দাসের সাথে কথা বলতে চায়। আর সেজন্যই সে আলোদিদির কাছে দুটো দিন সময় চেয়ে নেয়। ফিস্টির রাতে উপস্থিত বড়রা সবাই রঘুকে আশীর্বাদ করে, কিছু টাকা দিল। বলল, ওই টাকা তার পড়াশোনার কাজে লাগাতে।

সকলের ভালোবাসায় রঘুর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। সে ঠিক করে ফেলল, পুরুলিয়ার স্কুলে সে যাবে না। এই চা-ঘরে থেকেই সে পড়াশোনা করবে।]

* * * * *

রাত প্রায় বারোটা বাজে। চা-ঘরের কোনের একটা টেবিলে বসে রঘু পড়াশোনা করছিল। রাতের কাজ কর্ম সেরে সে রোজ দু আড়াই ঘন্টা নিশ্চিন্ত মনে লেখা পড়া করে। চারিদিক তখন শান্ত হয়ে যায়, তাকে কেউ আর বিরক্ত করে না। প্রথম ক'দিন এই সময় পড়তে বসলেই খুব ঘুম পেত। সারাদিন খাটা-খাটুনির ক্লান্তিতে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসত রঘুর। চোখে জল দিয়ে, এটা ওটা করে জোর করে জেগে থাকত সে। তারপর ধীরে ধীরে অভ্যেস হয়ে গেছে। রঘু জানে ঘুম পেলে ওর চলবেনা। ক্লাস টুয়েলভে ভালো রেজাল্ট করতে হলে ওকে খুব খাটতে হবে। আসলে নতুন ক্লাসের বইপত্র দেখে ও কদিনের মধ্যেই বুঝে গেল যে আলোদিদি একেবারে ঠিক কথা বলেছিল। স্কুলে না গিয়ে, প্রাইভেটে পড়ে উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করা খুব কঠিন। বিশেষত অংক আর ইংরেজি কেউ সাহায্য না করলে সে ম্যানেজ করতেই পারবে না। অন্য বিষয়গুলো নিজে মন দিয়ে পড়লে আর মাস্টার মশাই একটু দেখিয়ে দিলে ওর তেমন অসুবিধা হবে না। কিন্তু অংক, ইংরেজি ? কি করবে রঘু ? কালিচকে কোচিং ক্লাস অবশ্য আছে, ভালো টিউটরও আছে। কিন্তু সেখানে পড়তে গেলে অনেক টাকা লাগে। রঘুর এত টাকা কোথায় ? মাস্টার মশাই আর গোপেনবাবু সাহায্য না করলে রঘুর পড়াশোনা হয়ত আর এগোতই না ! ইংরেজির জয়ন্ত স্যার তো রঘুর সব কথা শুনে বলেই দিলেন, এরকম ছাত্র উনি ক্লাসে নিতে পারবেন না। কারণ তাতে অন্যর ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা আপত্তি জানাতে পারেন। বীরেশ্বর মাস্টার অনেক বুঝিয়েছেন, দু-চারজন অভিভাবকদের সাথেও কথা বলেছেন, তারপর জয়ন্ত স্যার রঘুকে পড়াতে রাজী হয়েছেন! অঙ্ক স্যারের বেলাতেও ঝামেলা কম হয়নি ! কালিচকে অঙ্কের ভালো টিউটর কম। অঙ্কের টিউটর হিসেবে গোপেনবাবুর ভাগ্নে সুজয় স্যারের খুব সুনাম। তার কাছে যারা পড়তে চায়, তারা এক বছর আগেই নাম লিখিয়ে রেখেছে। রঘু তো সেসব কিছুই করেনি। আর, সে কোনো স্কুলেও পড়ে না! তারও উপর সে গরীব। টিউশনির পুরো ফীস দিতে পারবে না। রঘু কাঁদো কাঁদো মুখে অনেক অনুরোধ করল। তাতেও কিছু হত না, যদি না গোপেন বাবু গিয়ে কথা বলতেন ! দুজন স্যারই শেষ পর্যন্ত সব কিছু দেখে শুনে রঘুকে অর্দ্ধেক ফীস নিয়ে পড়াতে রাজী হলেন। কিন্তু কথা হল তাঁরা মাঝে মাঝেই টেস্ট নেবেন। তাতে ভালো না করলে ওনারা আর পড়াবেন না। সামনের সপ্তাহে সুজয় স্যার একটা পরীক্ষা নেবেন বলেছেন। পরীক্ষায় রঘুকে ভালো নম্বর পেতেই হবে। আর ভালো নম্বর পেতে হলে তো খাটতে হবে। খাটতে অবশ্য রঘুর একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু রঘুর সমস্যা সময় নিয়ে। সারাদিন কাজ করলে পড়বে কখন? অনেক বলে কয়ে জিতেন দাসকে রাজী করিয়েছে, যাতে বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর রঘুকে কাজ করতে না হয়। জিতেন দাস রাজী হচ্ছিল না। বলে, তোকে ছুটি দিলে অন্যেরাও তো ছুটি চাইবে। তাহলে আমার দোকান চলবে কি করে? রঘু বলল – 'দাদু আমার মাইনে কম করে দাও। কাজ কম তো, টাকাও কম!'

জিতেন অবাক হয়ে বলে – 'মাইনে কম করলে তুই টিউশনির ফীস দিবি কি করে?'

রঘু একটুও না দমে উত্তর দেয় – 'হয়ে যাবে দাদু। সেই মাংস ভাতের দিন তোমরা সবাই মিলে আমায় আট হাজার টাকা দিয়েছিলে। তা ছাড়াও জমানো টাকাও তো কিছু আছে। হয়ে যাবে দাদু!'

জিতেন দাস শেষ পর্যন্ত মেনে গেল। অন্য কর্মচারীদের মধ্যে একটু আধটু অসন্তোষ এলেও ব্যাপারটা তেমন কিছু এগোয়নি। এর একটা কারণ, ওই সময়েই নিত্যানন্দ এসে দোকানের কাজে যোগ দিল। নিত্যানন্দের বয়স বছর পঞ্চাশ। কিন্তু খুব কাজের মানুষ। বউ মরে গেছে। একটা ছেলে আছে, সে শিয়ালদায় থাকে। ওখানেই একটা কাপড়ের দোকানে কাজ করে। নিত্যানন্দ আগে যে কারখানাতে কাজ করত, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তার দিন চলা মুস্কিল হয়ে গিয়েছিল। কাজটা পেয়ে সেও খুশী। কালিচকেই একটা টালির ঘর আছে তার। একটু রাত হলেও তার বাড়ি ফিরতে কোনো অসুবিধা হয় না। তাই এখনো রাতে দোকানে থাকার লোক বলতে শুধু রঘু আর মুরারী ! আজ মুরারী এখন ঘরে নেই। ওর গ্রামের বন্ধু কার্তিকের সাথে আড্ডা দিতে গেছে। কার্তিক কালীচকের কাছেই একটা গ্যারেজে কাজ করে ! আজকাল মাঝে মাঝেই মুরারী রাতে ওখানে যায়। ফেরে অনেক রাত করে। রঘু যদি জেগে থাকে তো গন্ধে টের পায় যে মুরারী মদ খেয়েছে ! রঘুর ভালো লাগে না। অস্বস্তি হয়। সে যথা সম্ভব ঠান্ডা মাথায় মদ্য পানের কুফল বিষয়ে যা কিছু জানে সবগুলো মুরারীকে বলেছে। অনেকবার মদ না খাবার সুপরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু মুরারী রঘুর কথা কানেই নেয়নি। আজ সারাদিন থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। সন্ধ্যো থেকে একটু ধরেছিল। কিন্তু এখন আবার বেশ তেড়ে বৃষ্টি এল। কড়কড় করে বিরাট শব্দে একটা বাজ পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় জোর ধাক্কা। মুরারীর গলা শুনতে পেল রঘু। তার নাম ধরে ডাকছিল। ঝটপট উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল রঘু। আর সঙ্গে সঙ্গে জড়া-জড়ি অবস্থায় হুড়-মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল দুজন মানুষ। একজন মুরারী, অন্যজন একটি মহিলা। বাইরে জোর বৃষ্টি পড়ছিল। মুরারী দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঘটনার আকস্মিকতায় এবং মুরারীর সঙ্গের মহিলাটিকে দেখে রঘু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘরের মাঝখানে একেবারে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহিলার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, মুরারী আর তার সঙ্গীনী দুজনেই নেশাগ্রস্ত। ওরা দুজনেই অল্প বিস্তর ভিজে গিয়েছে। মেয়েটা টলতে টলতে ঘরের ভিতরে ঢুকে একটা টেবিলে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে চুল আর মুখ মুছল। আর তার পরেই টান মেরে ভেজা শাড়িটা ফরফর করে খুলে ফেলল। অবাক ও সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে রঘু সেদিকে তাকিয়েছিল। ওর দিকে নজর পড়ল মেয়েটির। পায়ে পায়ে রঘুর দিকে এগোতে এগোতে মুরারীকে উদ্দেশ্য করে বলল – 'তোমার এখানে যে এমন একটি কেষ্টঠাকুর আছে, সেকথা তো কখনও বলনি?' মেয়েটাকে এগোতে দেখে রঘু রান্নাঘরে পালাতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারল না। তার আগেই মেয়েটা খপ করে ওর হাতটা ধরে ফেলল। খিলখিল করে হাসতে লাগল সে। সেই হাসির সাথে মুরারীও যোগ দিল। রঘুর ভীত চকিত অপ্রস্তুত অবস্থা মেয়েটা দুচোখ দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল। এবার হাতদুটো রঘুর দুই কাঁধে রেখে ওকে একটু কাছে টানল। রঘু যেন একেবারে সম্মোহিত। পা বুঝি মেঝের সাথে আটকে গেছে। নড়তেও পারছে না। তার মুখ লাল হয়ে গেছে। মাথাটাও কেমন করছে!

মেয়েটা তার নেশাগ্রস্ত ঢুলুঢুলু চোখে রঘুর দিকে তাকিয়ে বলল বলল – 'পালাচ্ছ কেন কেষ্টঠাকুর ? রাধিকাকে কি পছন্দ হয়নি? একবার ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো, নজর ফেরাতে পারবে না!' বলতে বলতেই মেয়েটা রঘুর বুকের উপর লেপ্টে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। তীব্র অস্বস্তিতে রঘু ওকে ঠেলে নিজে সরে যেতে চেষ্টা করছিল ! কিন্তু নেশা করলে কি হবে, মেয়েটার গায়ে জোর আছে! সে এবার মরিয়া হয়ে রঘুর হাতদুটো নিজের কাছে টেনে নিল। একটা হাত চেপে ধরল তার অর্ধ-অনাবৃত সুপুষ্ট স্তনের উপর! এতক্ষণে যেন একটা ঘোর থেকে জেগে উঠল রঘু ! তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। সেটা রাগে, না ভয়ে, না উত্তেজনায় রঘু বুঝতে পারল না। এবার এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে একছুটে বাথরুমে ঢুকে মুখে চোখে সমানে জলের ঝাপটা দিতে লাগল !

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রঘু রেস্টুরেন্টের দিকে আর গেলই না। বাথরুমের পাশেই একটা ছোট্ট ভাঁড়ার ঘর। সেখানে আটা, ময়দা, তেল, চাল ইত্যাদির সাথে আরো অনেক কিছু রাখা থাকে। রঘু সেই ঘরটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঢোকার আগে মুরারীর কথা শুনতে পেল – 'কাজটা ভালো হল না, বিজলী!' জড়ানো গলায় বিজলী, অর্থাৎ সেই মেয়েটি কিছু বলল। কিন্তু রঘু সেটা ঠিক শুনতে পেল না। ভাঁড়ার ঘরে জিনিস পত্র রাখার পর নড়া-চড়ার জায়গা খুবই কম। কিন্তু তার মধ্যেই রঘু মেঝেতে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়েও কিন্তু ও ঘুমোতে পারছিল না। রাগ, ভয়, দুঃখ সব মিলিয়ে ওর অদ্ভুত একটা কষ্ট হচ্ছিল! রঘুর মনে হচ্ছিল, মুরারী আর আগের মত নেই। খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে সে। মদ যে মুরারী আগে কখনো খায়নি, এমন নয়। দোলের দিন বা বিজয়া দশমীর দিনে বন্ধুদের সাথে কখনো সখনো রঘু ওকে নেশা করতে দেখেছে। কিন্তু তাই বলে আগে কখনো এই রকম ঘন ঘন নেশা করুতে দেখেনি। আর মেয়েমানুষ নিয়ে এসব কাণ্ড করবে মুরারী, একথা সে ভাবতেই পারেনি! রঘু এখন কি করবে? মুরারী যদি আবার এরকম মেয়েমানুষ নিয়ে চা-ঘরে আসে ? রঘু ভেবে পায় না – মুরারী মেয়েটাকে নিয়ে এখানে এল কেন? মুরারী এরকম করলে রঘু এখানে থাকতে পারবে না। কোথায় যাবে সে? রঘু ভাবে, তার কি সব কথা জিতেনদাদুকে বলে দেওয়া উচিত? তাতে যদি মুরারীর চাকরি চলে যায়? সেটা কি ঠিক হবে? মুরারীর কাছে কত কিছু শিখেছে সে! যখন ছোট ছিল, তখন ওই মুরারীই তো ওকে দেখে দেখে রাখত। আর আজ ওর জন্য মুরারীর চাকরি চলে যাবে ! না এটা ঠিক হবে না। তা'হলে কি করা উচিত এখন? ভাবতে ভাবতে রঘু দিশেহারা হয়ে পড়ে। আর এরকম ভাবতে ভাবতেই কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। রঘুর যখন ঘুম ভাঙল, দেখল ঘরের একমাত্র ছোট্ট জানলাটা দিয়ে ভোরের প্রথম আলো এসে পড়েছে তার উপরে। সে উঠে খুব আস্তে, নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলে এদিকে ওদিকে মাথা ঘুরিয়ে উঁকি মেরে দেখল, মুরারী তার নিজের বিছানায় ঘুমোচ্ছে। আর সেই মেয়েটা কোথাও নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল রঘু। তারপর সদর দরজা খুলে প্রায় নিঃশব্দে চা-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। রাস্তা ঘাট, দোকান বাজার সব তখন ঘুমিয়ে আছে। বৃষ্টিধোয়া শান্ত শহরটাকে কেমন অচেনা লাগছিল রঘুর। এ সময় কখনও সে রাস্তায় বেরোয় না। আজ বেরিয়ে ভারি ভালো লাগল। হাওয়াটা বেশ ঠান্ডা। রঘুর এখন কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছিল না। নিরুদ্দেশের পথে যাওয়ার মত করে সে বড় রাস্তা ধরে সোজা হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতেই দেখল হুশ হাস করে দুটো একটা গাড়ি পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু একটু করে আলো বাড়ছে। জলে ভেজা গাছের পাতা, ঝোপ ঝাড় সূর্যের আলোতে ঝিলমিল করতে লাগল। এক ঝাঁক পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল দক্ষিণের বড় ঝিলের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে অনেকখানি চলে এসেছে রঘু। সামনে দেখল রাস্তার ডান দিকে একটু ঢুকে বেশ সুন্দর একটা পার্ক। মনে মনে ভাবল, আশ্চর্য, এত বছরের মধ্যে কখনো সে এই দিকে আসেনি, নাকি পার্কটা তার চোখে পড়েনি ! রঘু পার্কে ঢুকে একটা খালি বেঞ্চিতে বসে পড়ল। চারপাশে গাছ-গাছালি, সবুজ মনোরম পরিবেশ। পার্কের মাঝখানটায় বোধহয় বাচ্চারা খেলে। ওখানটায় তাই ঘাস উঠে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। জনা-দুই ভদ্রলোক প্রাতঃভ্রমনে এসে চারপাশের পায়ে চলার রাস্তা ধরে চক্কর লাগাতে শুরু করেছে। হঠাৎই রঘুর মনে হল, এই পৃথিবীতে কোন একটা জায়গায় তার একজন বাবা আছে। সেও হয়ত আজ এই ভদ্রলোকদের মতোই নিশ্চিন্তে প্রাতঃভ্রমনে বেরিয়েছে। আজ রঘু যদি সেই মানুষটার কাছে থাকত, তা হলে তাকে আর এই রকম দূরবস্থার মধ্যে পড়তে হত না ! এই কথাগুলো মনে হতে রঘু নিজের উপরেই বিরক্ত হল ! যে বাবার কোন অস্তিত্বই নেই তার জীবনে, তার কথা রঘু ভাবতেই চায় না! তবুও যে কেন ভাবনাটা বার বার চলে আসে! সমস্ত শরীরটা ঝাঁকিয়ে এই ভাবনা-চিন্তাগুলোকে দূরে সরিয়ে দিয়ে রঘু উঠে দাড়াঁল! এবার ওকে ফিরতে হবে !

রমা জোয়ারদার – দিল্লীর বাংলা সাহিত্য মহলে একটি পরিচিত নাম। গত কুড়ি বছর ধরে দিল্লী, পশ্চিমবাংলা ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হওয়া সত্বেও তিনি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। প্রকাশিত ছোট গল্প সংকলনঃ (১) রোজ নামচার ছেঁড়াপাতা; (২) সবুজ ঢেউ আর ঝাপসা চাঁদ।

মমতা দাস (ভট্টাচার্য)

খেলা

আজ যা হয়ে গেল, তারপর আর প্রদ্যোতকে মাপ করা যায়না। ঝগড়া তাদের রোজ হয়, বিয়ের পর হনিমুনের রেশ কেটে নতুন বিয়ের গন্ধ গা থেকে মোছার আগেই ঝগড়া শুরু। এত অমিল দুজনের স্বভাবে, কুষ্ঠিতে নাকি রাজযোটক ছিল, কে জানে বাবা। উল্টোদিকে হবে বোধহয়। কোন বিষয়ে তাদের মতের মিল হয়না – পোষাক-খাওয়াদাওয়া-বেড়ানো-সিনেমা-ঘরসাজানো.....। নাঃ একরকম পছন্দের একটা বিষয় মনে করতে পারেনা গীতশ্রী। নয় নয় করে পাঁচবছর। জীবন চলছে, খুঁড়িয়ে, ছেঁচড়ে কোনরকমে। প্রশ্ন উঠবে চালানোর দরকারটা কি ? কারণ গীতশ্রীর পায়ের জোর নেই। মা-বাপ পরপর মরেছে তার জন্মের কয়েকবছর পর। কাকা-কাকির কাছে দুরছাই হয়ে বাঁচা। কোনমতে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ, নিজের চেষ্টায়, বন্ধুদের সাহায্যে কম্পিউটার-এর একটা ছোটখাটো ডিপ্লোমা, কিন্তু চাকরী ? কাকি মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল 'মহারানী চাকরীতে গেলে সংসারের একবোঝা কাজ সামলায় কে ? হাসি পায় গীতশ্রীর, যেন এটা তার সংসার। কাজেই চাকরি করা, স্বাধীন হওয়া স্বপ্নই থেকে গেল। তার মধ্যে মামার বন্ধু সম্বন্ধ আনল, সরকারী চাকুরে যুবক, কাজ ছোটখাটো, তবে তিনকূলে কেউ নেই, নির্ঝঞ্ঝাট। বিনা পণে সোমত্ত মেয়ে বিয়ে করতে চায়, বিয়ের খরচ সেই দেবে, ঝামেলা নেই মোটে, সংসারের কাজ আর রাতে বিছানায় রোজের দৌরাত্য . . . এই মাত্র। দারুণ সুযোগ। বিয়ে হল, গীতশ্রী এসে দেখল, কোন মিল নেই স্বভাবে, যা বলবে, করবে সে, তার-ই সমালোচনা, ঝগড়া। শুধু বিছানায় রোজ চাই শরীর, মন নয়। তবু পাশে থাকলে একটা ভালবাসা তৈরী হয় বইকি। রোজের ঝগড়াও অভ্যেস হয়েগেল। গীতশ্রী প্রতিপক্ষের কাছে হারতে রাজি, যতক্ষণ সীমা না ছাড়ায়। লক্ষণের গন্ডী পেরোলেই . . .। আজ তাই করেছে প্রদ্যোৎ, গীতশ্রীর গায়ে হাত তুলেছে। এতদিন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-ঝগড়া যাই করুক শারীরিক কোনো অত্যাচার করেনি। শুধু রাত্রে, বিছানায়..... সে আর কি করা ? মেনে না নিয়ে উপায় নেই, বিয়ে হয়েছে মানেই তোমার শরীরটা স্বামীর সম্পত্তি। দেবতাটিকে তুষ্ট করা মেয়েদের একমাত্র কাজ, দিন-রাত যখন ইচ্ছা হবে, মেয়েটার ইচ্ছা বা অসুবিধার কোনো দাম নেই। কারণ বেশিরভাগ মেয়ের পায়ের জোর নাই, দাঁড়াবার জায়গা নাই। যাদের সেটা আছেও, তাদের সমর্থনের জায়গা নাই। বাপ-ভাই-আত্মীয় সকলের সম্মান ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে, শুধু মেয়েটার...। সম্মান, ইচ্ছা এই শব্দগুলো মেয়েদের জন্য নয়। বিয়ে করে একটা লোক তোমাকে ধন্য করেছে, এখন তোমার শরীর তার অধিকার। সে যখন যেমন চাইবে . . .। তা করছে গীতশ্রী, প্রতিটি রাত তার যন্ত্রণার রাত। কে জানতে চায় তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, শারীরিক অসুবিধার কথা ? ছুটির দিনে দিনেরবেলাও, কেউ তো নাই সংসারে, যাতে সংকোচ হতে পারে। সহ্য করে গীতশ্রী, দাঁতে দাঁত টিপে, যতই কষ্ট হোক তবু, মনে মনে ঠাকুরকে ডাকে যাতে এই পাশবিকতা দ্রুত শেষ হয়। সে তো রোজকার ব্যাপার। কিন্তু আজ। রান্নাঘরের সব কাজ মিটিয়ে, শুতে আসতে কিছু দেরি হয়েছিল,ওবেলা প্রদ্যোতের কজন বন্ধুর খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল, সারাদিন যজ্ঞীর রান্না করে ক্লান্ত গীতশ্রী, সারা সন্ধ্যা এদের বন্ধুদের বিশ্রী রসিকতা সহ্য করে তিতিবিরক্ত সে। আর ওই বিপুল। লোকটাকে দেখলেই কেমন ঘেন্না করে গীতশ্রীর, কেমন যেন তৈলাক্ত হাসি, লালসার চাউনি। এরকম একটা লোক প্রদ্যোতের বন্ধু কি ভাবে হয়, সেও অবাক কান্ড। যাইহোক, তবু গৃহিণীর যাবতীয় কাজ সেরে, রান্না ঘর গুছিয়ে, ঘরে আসে। রোজ মনে মনে চায় যেন লোকটা ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু সে সুখ কোনদিন পায়না ! ঘরে ঢুকে দেখে বিছানার ধারে বসে সিগারেট খেতে খেতে পা দোলাচ্ছে লোকটা, মুখটা বেশ খুশি খুশি। আবার কি মতলব চাগিয়ে উঠল কে জানে। গীতশ্রী কাছে আসতেই ঝট করে জড়িয়ে ধরে 'আমার লক্ষী বউ, সোনা বউ' করে আদর। গীতশ্রী অবাক। এরকম নরম আদরতো সেই শুরুর মাসখানেকের পরে আর পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। জিজ্ঞাসু চোখে চাইতেই প্রদ্যোত বলে – 'একদিন বিপুলের সঙ্গে শোবে তুমি ?' 'মানে ?' রাগে কথা ফোটে না গীতশ্রীর, 'মাত্র একদিন, অনেক টাকা দেবে বলেছে, তাহলে নতুন ফ্ল্যাটের ডাউন

পেমেন্টটা....' গীতশ্রী ছিটকে সরে যেতে চায় – 'পাগল নাকি, নিজের বৌকে'। অমনি স্বরূপে প্রকাশ 'কেন হবে না ? একদিনমাত্র, এত সতীপনা না দেখালেও চলবে, আমার বউ আমি বলছি, আর তুমি' তবুও মাথা নাড়ে গীতশ্রী, শরীরটা তার নিজের, স্বামীর সম্পত্তি নয়। এবার রেগে যায় লোকটা জোরে এক চড় কষিয়ে দেয়। না রাগলে চলবে না, দাঁতে দাঁত চেপে গীতশ্রী মনকে বোঝায়, ফাঁস ক্রমেই শক্তহচ্ছে, পুরো জালে ফাঁসিয়ে নেওয়ার আগেই..... 'কিছু বলছনা যে' বউ-এর মুখে চেয়ে সাগ্রহ প্রশ্ন। 'আচ্ছা সে পরে ভাবা যাবে, এখন ছাড়, তোমার দুধের গ্লাস রেডি করেও আনতে ভুলে গেছি, নিয়ে আসি' ছেড়ে দেয় লোকটা, খুব খুশি তার প্ল্যানটা কাজে লাগছে, এই তো শুরু, এরপর..... ক্রূর হাসি ফোটে মুখে। গীতশ্রী রান্নাঘরে যায়, একলা নিস্তব্ধ রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবে, না আর ভাগ্যকে দোষ দেওয়া নয়, এবার নিজেই যাহোক . . .। ঘরে ফিরে এসে, চামচ দিয়ে শেষবার নেড়ে গ্লাসটা স্বামীর হাতে তুলে দেয়। সবটা দুধ একটানে শেষ করে, পরিতৃপ্ত প্রদ্যোত বৌকে টেনে নিয়ে বিছানায়.....।

রাতের আদরের অত্যাচার শেষ হওয়ার আগেই প্রদ্যোত বিরাট হাই তুলে বলল, আজ কেন যে এত ঘুম পাচ্ছে, তোমার সঙ্গে প্রেমটা অব্দি জমল না ঘুমের চোটে, ধূর। বাথরুম যেতেও ইচ্ছে করছে না। বাইরের দরজা-টরজা আজ তুমি-ই বন্ধ কর। বলেই প্রচন্ড নাক ডাকাতে শুরু করে। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে হাসে গীতশ্রী, দরজা বন্ধ করেই শুতে এসেছে সে। কিন্তু মুক্তির দরজাটা শুধু খুলে দিয়েছে আজ। ঘুমের সমস্যাটা জ্বালাত মাঝে মধ্যে। অনিচ্ছুক শরীর-মনের উপর অত্যাচারে ঘুম আসত না, চোখের জল ফেলা আর ভাগ্যকে দোষারোপ। ভাগ্যিস, ঘুমের ট্যাবলেট গুলো ছিল। নইলে অতগুলো ট্যাবলেট . . .। পেনশনের টাকা আর এই ছোটোখাটো বাড়ি, দিব্যি ! খেলার শেষটুকু-ই ঠিক করে ফলাফল, হারা-জেতা। নিজেও হাই তুলে ওষুধ ছাড়াই আজ গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় গীতশ্রী, মুখে লেগে থাকে অদ্ভুত একটা হাসি।

:: সমাপ্ত ::

মমতা দাস (ভট্টাচার্য) – স্বাধীনতার কিছু পরে ওপার বাংলার (তখন পাকিস্তান) সিলেট জেলায় জন্ম। তিন বছর বয়সে শিকড় উপড়ে এপার বাংলায়। জীবনের প্রয়োজনে দেশের নানাপ্রান্তে, বিদেশেও প্রবাসী জীবন। দীর্ঘপ্রবাসের পর কলকাতায় ফেরা। যৌবনের ছেড়ে যাওয়া শহরটা বদলে গেছে। মন খারাপ। তবু লিখে যাওয়া। তিনটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশের পর দুটি কাব্য গ্রন্থ। ইতিমধ্যে মুম্বাই, ডুয়ার্স এবং কলকাতার বিভিন্ন কাব্য সংকলনে অন্য কবিদের পাশে স্থান পাওয়া। বাংলাদেশ থেকেও সংকলনে কবিতার স্থান লাভ। সতত নিরত সাহিত্য চর্চায়। পেশা নয়, নেশা।

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিসুখ

১

"গর্‌র্‌র্‌-গর্‌র্‌র্‌-ফচাক। গর্‌র্‌র্‌...গর্‌র্‌র্‌র্‌-অর্‌র্‌-ফচাক। নয় দশবার গার্গেলের পর শুরু হল – ঘ্যাঙর ঘ্যাং, ঘ্যাসো, ঘ্যাসো, অ্যা....অ্যা.... থু থু থুঃ!"

"খ্যাক থু করতে পারো না। মুখ ঝুঁকিয়ে মাধ্যাকর্ষণের ওপর ভরসা করার কী আছে ? ও কী ? ওয়াক তুলছ যে। কচি বাচ্চা নাকি কফ তুলতে গিয়ে বমি করে ফেলবে ? এখন ঠ্যাকায় পড়ে গার্গেল করছ। রোজ একটু ভেপার নিতে কী হয় ?"

কাশির দমকে বলাকা শীর্ষের কথার জবাব দিতে পারল না।

শীর্ষ বলে চলল, "ছোটবেলা থেকে কোনও হেলদি হ্যাবিট গ্রো করোনি। সকালে একটা নির্দিষ্ট সময়ে উঠে একটু গরম জলে মধু লেবু দিয়ে খেলে, দিনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্নান করলে, টাইমলি খাবার খেলে, একটু এক্সারসাইজ করলে। তা নয়। কোনও ডিসিপ্লিন শেখোনি। শুধু পটাপট ওষুধ খেয়ে ঝিমিয়ে থাকবে।"

নাক গলায় তীব্র জ্বালা আর শ্লেষ্মার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বলাকা জুতসই উত্তর ভাবতে লাগল। এই ঠান্ডা লাগা নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে কম কথা শুনতে হয়নি। শ্বাশুড়ির বক্তব্য, এত খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে নাকি বিয়ে করাই উচিৎ হয়নি। যেন বলাকার মা বাবা চিকিৎসা না করিয়ে রোগ লুকিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। মা বলছে বলছে, ছেলে কোথায় বৌ আর শ্বশুরবাড়ির সম্মান রক্ষা করবে, তা নয় মায়ের কথায় দোয়ারকি দেয়। শীর্ষ খুব ভালো করে জানে বলাকা প্রথমটায় গার্গেল বাষ্প প্রশ্বাস নেওয়া ইত্যাদি করেও ফল না পেলে তখনই ওষুধের শরণাপন্ন হয়। নিতান্ত অপারগ হলেই ব্রহ্মাস্ত্র অর্থাৎ স্টেরয়েড। ব্যায়াম যোগাসন করে না ঠিকই, কিন্তু ঠাণ্ডা যাতে না লাগে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানী। পচা গরমেও কনকনে জল খায় না, ঠান্ডা পানীয় পান করে সইয়ে সইয়ে, গাড়িতে চাপলেই গলায় মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে নেয়। নিশ্ছিদ্র আবরণের ফাঁক ফোকর দিয়ে তাও যদি ঠাণ্ডা ঢুকে পড়ে তো কী করার আছে? ধূলো ধোঁয়া এড়ানো কি বলাকার হাতে থাকে? ঘর পরিস্কার করবে না? আরও কোনও কিছুতে অ্যালার্জি আছে কিনা অনেকবার পরীক্ষা করিয়ে জানতে চেয়েছে। সে দিকে শীর্ষর গাফিলতি। শুধু সব দোষ বলাকার ঘাড়ে চাপিয়ে খালাস। যদি বৌ অসুস্থ হয়ে থাকে তার চিকিৎসা করানো তোমার কর্তব্য, ব্যাস্! কথা বলতে গেলেই নাক গলার ভেতর থেকে শ্লেষ্মা জড়িয়ে ধরছে, তার সাথে নাক ও টাকরার অসহ্য জ্বালা করে উঠছে। এমনিতেই গলার একদিকে যেন তলোয়ারবাজি চলছে, শূল ফুটে আছে। কিছু খেলে বিশেষ করে গরম কিছু পান করলে গলাটা সাময়িক রেহাই পায়। চা জলখাবারের পর হয়তো একটু কষ্ট কমতে পারে। তখন বরের এক তরফা বাক্য বর্ষণটাকে ঝগড়ায় রূপান্তরিত করা যাবে।

পেশার কারণে বকবক করতে হয় বলে গলায় চাপ পড়েই থাকে। কলেজ ছুটির কয়েকটা মাস একটু যেন ভালো থাকা যায়।

২

"আপনি কি ডাক্তার? – ডাক্তার ভদ্রলোক কঠিন চোখে তাকালেন বলাকার দিকে।"

"না, একজন এক্সপিরিয়েন্সড রুগী।"

"কতদিনের এক্সপিরিয়েন্স আপনার? আমি ষোল বছর প্র্যাক্টিস করছি।"

"আমার বয়েস উনত্রিশ। প্রথম দশ-বারো বছর ভুগলেও অত রোগবালাই চিনতাম না। তারপর থেকে ভুগে ভুগে আর ডাক্তার দেখিয়ে দেখিয়ে অসুখের নাম আর ওষুধের নাম সবই মোটামুটি – "

"নিজের অসুখ তো নিজেই ডিটেক্ট করে বসে আছেন? ওষুধও সাজেস্ট করছেন। আমার কাছে এসেছেন কেন?"

"আমার প্রেসক্রিপশন লেখার রাইট নেই ডাক্তারবাবু। তাছাড়া ওষুও তো চেঞ্জ হচ্ছে। আগে যে ওষুধকে অব্যর্থ মনে করা হোত সেগুলোয় আর কাজ হতে চায় না। জীবাণুরাও নিজেদের প্যাটার্ন চেঞ্জ করছে, থার্ড জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিকেও রেজিসটেন্স গ্রো করে ফেলেছে। রক্সিথ্রোমাইসিনে আমার কোন কালেই কাজ হয়নি। অ্যাজিথ্রোমাইসিন আসার আগে আমায় গলার কষ্ট বিটাডাইন দিয়ে গার্গেল করে না কমলে স্টেরয়েড খেতে হোত। ঐ বিটাডাইন বা ওকাডাইন গার্গেল আর অ্যাজিথ্রোমাইসিন ছাড়া আমার কষ্ট কিছুতেই কমবে না।"

"আপনি এসেছেন আমার অ্যাডভাইস নিতে। আমি আপনার অ্যাডভাইসে চলব না। এত জানেন যদি নিজের প্রেসক্রিপশন নিজে লিখে ওষুধ কিনে নিন। ফিজিশিয়ানের প্রেসক্রিপশন ছাড়াও ওভার দ্য কাউন্টারও তো ওষুধ বিক্রি হয়। যেমন দেশ, কোনও রেস্ট্রিকশন নেই"। ডাক্তার সাহা প্রায় দাঁতে দাঁত পিষে বললেন। এইসব ডেঁপো রুগীগুলো সব জেনে বসে আছে। ডাক্তারের ফি বাঁচাতে নিজেরাই ওষুধ খাবে।

"কিন্তু আমি নিজে ওষুধ কিনলে অফিস থেকে রি-ইমবার্সমেন্ট পাব না। আপনি কাইন্ডলি যদি ওগুলো প্রেসক্রাইব করেন.."

ডাক্তার তির্যক সাহা খিঁচিয়ে উঠলেন, "আমি কি আপনার কাছে ডাক্তারি শিখব নাকি? ইচ্ছামতো প্রেসক্রিপশন পেতে গেলে কোনও কোয়াক-কে ধরুন। আপনার অত ওষুধের নাম জানার তো প্রয়োজন নেই। আপনার কী কষ্ট জানাবেন, ডাক্তার সেই বুঝে ওষুধ দেবে। বেশি বুঝে গিয়েই সমস্যা বাড়িয়েছেন। জানেন কি সেল্ফ মেডিকেশন ইজ আ ক্রাইম? বিদেশে কোনও সিভিলাইজড কানট্রিতে উইদাউট প্রেসক্রিপশন একটাও মেডিসিন বিক্রি হয় না। এখানে সবাই সবজান্তা। আমি এভাবে ট্রিটমেন্ট করি না।"

শীর্ষ তার বাগ্মী স্ত্রীকে থামতে ইঙ্গিত করছিল। এবার বিরক্ত গলায় বলল, "তুমি চুপ করো না। ডাক্তারবাবুকে ডিসাইড করতে দাও। এতদিন তো নিজের মতো চললে। ওনার কাছে এসেছ যখন –"

"কিন্তু রক্সিথ্রোমাইসিনে আমার কাজ হবে না। নুন জলে গার্গেল করলে আমার কষ্ট আরও বেড়ে যায়।"

ডাক্তার সাহা এবার ফেটে পড়লেন, স্যরি ম্যাডাম, আমি আপনার চিকিৎসা করব না। আপনি যা ভালো বোঝেন করুন, যে ডাক্তার আপনার কথা শুনে চলবে তার কাছে যান। নেক্সট – বেল বাজিয়ে দিলেন।

শীর্ষ রোষ কষায়িত চোখে বলাকার দিকে তাকাল। বলল, "আপনি আপনার মতো প্রেসক্রাইব করুন।"

বলাকা মন্তব্য করল, "হ্যাঁ, ভিজিট যখন দিতেই হবে –"

শীর্ষ বলাকার হাতে একটা মোক্ষম চিমটি কাটল। বাইরে এসে ওষুধ কিনল বলাকার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে। ওষুধের দোকানের ভেতরেই ছোট পলিক্লিনিক। একমাত্র বৌ রাস্তায় অত্যন্ত তালকানার মতো হাঁটে বলে সঙ্গে থাকলে পারতপক্ষে হাত ধরে রাস্তা পার করে দেয়। আজ ওষুধ কিনেই পিছু ফিরে না তাকিয়ে হনহন করে রাস্তা পার হয়ে গেল। বলাকা বরকে প্রথমে দোকানের ও পরে রাস্তার ভিড়ে কোথাও খুঁজে না পেয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। রাস্তার ওপারে দেখতে পেয়ে ছুটন্ত যানবাহন না দেখেই রাস্তা পেরোতে গেল। একটা বাস প্রায় গা ঘেঁষে বেরিয়ে যেতেই আবার চেষ্টা করল। বাধা পেল এক সারি অটো আর গাড়ির জন্য। শীর্ষ একটা অটো থামিয়েও ছেড়ে দিল। গত পনেরো মিনিটে প্রথম বলাকার উদ্দেশ্যে

চিৎকার করল। ছুটে রাস্তা পেরিয়ে বৌয়ের বাহু চেপে ধরে প্রচণ্ড ধমক, "ইএনটি হল। এবার কি একেবারে হসপিটালাইজড হতে চাও?"

অটোয় চেপে আবার কথা বন্ধ। বলাকা একা বকবক করে থেমে গেল। বাড়িতে এসে খাবার টেবিলে ওষুধের প্যাকেট নামিয়ে শীর্ষ মেশিনগান চালিয়ে দিল, "একটু চুপ করে থাকতে পারো না? ডাক্তার কি তোমার স্টুডেন্ট যে তোমার অ্যাডভাইসে চলবে? শুনলে না সেল্‌ফ মেডিকেশন একটা অপরাধ? নিজে নিজে যখন যা ইচ্ছে ওষুধ খেয়ে আজ এই হাল করেছ। তোমার বাবাকেও দেখেছি একটা ঢেঁকুর উঠতে না উঠতেই পট করে অ্যান্টাসিড খেয়ে ফেললেন। সারাদিন শুয়ে থাকলে রাতে ঘুম আসতে দেরি হবেই, ব্যাস্ অমনি পটাপট ঘুমের ওষুধ। তোমার মাকেও বলতে শুনেছি জোড়া ট্রাপেক্স, জোড়া অ্যালজোলাম। সব জোড়া জোড়া। তুমিও জোড়া জোড়া অ্যাভিল, জোড়া জোড়া সেট্‌জিন। একটা ওষুধ খেয়ে কিছুক্ষণ ওয়েট করবে তো কাজ করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে রিলিফ না হলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে আর একটা। তারপরেই স্টেরয়েড। তোমরা একেবারে ইমপসিবল।"

"কথা হচ্ছিল আমার অসুখ নিয়ে, আমার মা বাবাকে টেনে আনলে কেন? সেই ছোটবেলা থেকে কষ্ট ভোগ করে করে আর ভালো লাগে না। যদি প্রাথমিক অবস্থায় ওষুধ না খাই ব্যাপারটা এত এক্সাজেরেট করে যে তখন কিছুতেই কমতে চায় না। কষ্ট ভোগ করি আমি তুমি তো করো না, বুঝবে না। শখ করে ওষুধ গিলি না। এই যেগুলো আনলে, হ্যাঁ-অ্যাঁ-আমি হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর, ওগুলোতে কষ্ট কমবে না। .. হ্যাঁ-চ্চো-। নাক দিয়ে সর্দি বেরিয়ে আসায় বলাকা ছুটল বাথরুমে। বেসিনে নাক ঝেড়ে বাইরে আসতেই শীর্ষ বলল, আগেই ধরে নিচ্ছ কেন কাজ হবে না? একেবারে বাবার কার্বন কপি!"

"তুমিও তোমার মায়ের ফোটোকপি। কথায় কথায় আমার বাবা মার পিণ্ডি চটকাও কেন? কাজ এতকাল হয়নি তাই বলছি হবে না। আমাকে অ্যাজিথ্রোমাইসিন এনে দাও। তুমি না পারো আমি নিজেই বেরোব। দোকানে আমার একটা কথাও শুনলে না, জবাবই দিলে না। অটো থেকে নেমেও বললাম প্রপার ওষুধটা নিয়ে বাড়ি ঢুকি, তাও করতে দিলে না। শোনো গলায় অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে, একটু আদা দিয়ে চা করো। আমি গা ধুয়ে এসে ভাত বসাচ্ছি, আজ আর রুটি করার এনার্জি নেই। হতচ্ছাড়া ডাক্তার একটা ইনহেলারও লিখে দিল না। ওগুলোর কী দাম। আর এই ওষুধে কাজ না হলে – সেই নিজেদেরকে কিনতে হবে, একটার দামও তুমি অফিস থেকে পাবে না। অবশ্য ক্লেমও করো না। আমার পার্ট টাইম চাকরি। পার্মানেন্ট হলে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতাম, তোমাকে তেল দিতাম না।"

শীর্ষ খুলে রাখা জুতো জুতোর তাকে ঢুকিয়ে বাইরের চটি পায়ে গলিয়ে বলল, "আগে তোমার প্রেসক্রিপশটা ফলো করি, তারপর ফিরে এসে চা, রাতের রান্না সব করছি। ততক্ষণে তুমি ছটা অ্যাভিল আর দশটা সেট্‌জিন খেয়ে ঝিমোও। আর কী আনতে হবে, সেলেস্টোন, বেটনাসল?"

"ওমনাকর্টিল।"

"এটার নাম শুনিনি তো, কবে থেকে শুরু করলে?"

"সেলেস্টোন বহুদিন হল বন্ধ হয়ে গ্যাছে। বংশীকাকু সেলেস্টোনের বদলে এটা দিল। তুমি শুনেছ, ভুলে গ্যাছ। ওমনাকর্টিল টেন কিন্তু।"

"তোমার বংশীকাকু কি ডাক্তার? তোমার মাকেও দেখেছি – ওফ্!" শীর্ষ দড়াম করে সদর দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

চুকুস্, চুকুস্, চুকুস্। এক রাশ ওষুধ খেয়ে, গার্গেল করে আর এক প্রস্থ গরম জলের ভাপ নিয়ে বোধহয় একটু আরাম পেয়েছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। কেন যে এত ভোগে? কলেজে পর পর দু'দিন ক্লাস নিয়ে ফিরলেই শুরু হয়ে যায়।

এবারে ট্রপিকালে নিয়ে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করাতে হবে। কিংবা এই সরকারি আরএমএ-এর চক্করে থাকলে চলবে না। আরও বড় ইএনটি দেখাতে হবে।

"উঠিয়ে মেমসাব। খানা লগা দিয়া। কষ্ট কমেছে? চুকুস্ চুকুস্ চুক চুক চুক..."

"উঁ ...। তখন থেকে কেবল ডান গালে হামু খেয়ে যাচ্ছে। জান না একদিকে আদর করলে আমার অস্বস্তি হয়?"

শীর্ষ মাথাটা গাল থেকে ফুট খানেক নামিয়ে এনে নাইটির ওপর দিয়েই ডান পাশে ঠোঁট দিয়ে আলতো কামড় বসিয়ে বলল, "আজ আমি দক্ষিণ পন্থীই থাকব। দেখি কত রাগতে পারো। উম্‌ম্‌ম্..."

"ধ্যাৎ, ছাড়ো! কটা বাজে? খাবে না?"

"খাচ্ছি তো। এটা তো অ্যাপিটাইজার। মেইন কোর্স ডিনারের পরে ..."

৩

"লাইট জ্বালিয়ে কী করছ এত রাতে?"

"একটা অ্যালপ্রাজোলাম খেলাম।"

"সকালে হিয়াকে স্কুলে পাঠাতে হবে, কটা বাজে দেখেছ? রাত তিনটের সময় ঘুমের ওষুধ খেয়ে সকালে উঠতে পারবে? তোমার কালকেও তো কলেজ আছে।"

"কাল মা বাবা ছোটকাকুর বাড়ি যাবে। হিয়াকে ওবাড়িতে রাখা যাবে না। আমি কাল কলেজে যাব না। সকালে প্রিন্সিপালকে ফোন করে জানিয়ে দেব।"

"কালকেই যেতে হবে? পরশু তোমার অফ ডে, পরশু যেতে বল। রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লে ঠিক ঘুম চলে আসে। ওষুধ একটা নেশা তোমাদের ..."

"দীপের হবু বৌকে দেখতে যাবে। ওরা পরশু না তরশু ব্যাঙ্গালোর ফিরে যাবে। কাকিমা মাকে ফোন করেছিল। বড় দাদা বৌদিকে তো বিরাট কিছু মান্য করে না, কিন্তু হবু পুত্রবধূকে দেখানোর খুব শখ। নিজেরাও তো বিয়ের পর বৌ নিয়ে সংসার করতে পারবে না। ছেলে ছেলের বৌ দুজনেই ব্যাঙ্গালোর চলে যাবে। রীতশ্রী তো দীপের চেয়েও উঁচু পোস্টে আছে।"

কথাগুলো স্বগতোক্তি হয়ে গেল। কারণ শীর্ষর নাক ডাকছে আবার বিকট জোরে। মেয়েটা বাবাকে জড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। শব্দকল্পদ্রুমে চমকে কেঁদে উঠল। বলাকা মশারির মধ্যে ঢুকে মেয়েকে চাপড়াতে লাগল। ঘুমের ওষুধ সে নিজে নিজে ধরেনি। বাচ্চা পেটে রাতে ঘুম হয় না শুনে বলাকার গাইনি ডাক্তারই লিখে দেন। বলাকা অভ্যাস হয়ে যাবে বলে দ্বিধা প্রকাশ করাতে বলেন, "ঘুমের ওষুধ খেলে আপনার যা ক্ষতি হবে তার চেয়ে অনেক বেশি আপনার বেবির ক্ষতি হবে যদি আপনি রাতে না ঘুমোন"।

শীর্ষর নাসিকা গর্জনের প্রাবল্য একটু কম হলে হয়তো বলাকাকে ঘুমের ওষুধ ধরতেই হোত না। কিন্তু এ কথা বললে শীর্ষ এক্ষুণি অন্য ঘরে গিয়ে শোবে। বলাকার এক দিদি বিয়ের পর পরই বলেছিল, "বরের সঙ্গে যতই অশান্তি হোক, কখনও বিছানা আলাদা করবি না। করলে কিন্তু ফেরা যায় না।"

৪

চাকরিটা শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিতে হল। অধ্যক্ষা মহাশয়া বলাকাকে দিয়ে এলোপাথাড়ি ক্লাস করাতেন। বলাকার স্পেশালাইজেশন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কিন্তু ও অধীত বিদ্যা প্রয়োগের অভাবে ভুলে যেতে চায় না। তাই গোটা মর্ডান ফিজিক্স ও ইলেক্ট্রনিক্সটাই পড়াতে হোত। এমনকি ধ্রুপদী পদার্থবিদ্যার কোনও কোনও অংশও একটু ঝালিয়ে নিয়ে ক্লাস নিতে পারে জেনে পদার্থ বিজ্ঞানের যখন যে অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা অনুপস্থিত, তখনই বলাকাকে দিয়ে পাস কোর্সের ক্লাস করিয়ে নিতেন।

অনার্সের ক্লাসটা তবু সামলানো যায়, কিন্তু পাস কোর্সের ছেলেগুলো এক একটা অবতার। একে তো সংখ্যায় অনেক, তারপর বলাকাকে যে কোনও ভাবে অপদস্থ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। যা পড়াতে ঢুকেছে তার দিকে মন নেই, কেবল বাইরের প্রশ্ন করে শিক্ষিকাকে প্যাঁচে ফেলাতেই তাদের আনন্দ। মেয়েগুলো সরাসরি অসভ্যতা না করলেও গোলমালের মধ্যে নিজেদের মধ্যে গজালি করে নিত। অথচ বলাকার মতো নিজের বিষয় নিয়ে সম্যক জ্ঞান খুব কম শিক্ষাদাতার আছে। কোনওটাই ওপর ভাসা ছুঁয়ে যেত না, সব প্রশ্নেরই মানে যে প্রশ্নের উত্তর হয়, সেগুলোর জবাব দিত। কিন্তু ক্লাসে শোরগোল থামাতে পারত না। যে শিক্ষিকা তার বিষয়ের ওপর যে কোনও অধ্যায় ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে, কোনও প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায় না, পূর্বতন অধ্যাপকের ভুল বোঝানো বা এড়িয়ে যাওয়া বিষয়টা ছাত্রছাত্রীদের প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিতে পারে, পড়ানোর সময় সে কেন শিক্ষার্থীদের মনঃসংযোগ ধরে রাখতে পারত না এটাই বিস্ময়ের। বিশাল ব্যাখ্যা শুনত গুটিকয় ছেলেমেয়ে। সবাই প্রাইভেট কোচিং নেয়। সেখানে নোটস্‌ও পায়, যা বোঝার বুঝেও নেয়। কলেজের শ্রেণীকক্ষের বক্তৃতায় মনোযোগ না দিলেও চলে যেন। বলাকা ক্লাসে নোট দিলেও অনেকেই লিখত না। বলত বান্ধবীদের কাছ থেকে পরে ফটোকপি নিয়ে নেবে বলে। বলাকা রেগে কাউকে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যেতে বললে সেটাও শুনত না। বলাকা নিজে চলে যাওয়ার হুমকি দিলেও হেলদোল নেই। এই শাখামৃগের দলই আবার বলাকার নামে অধ্যক্ষাকে নালিশ জানিয়ে এসেছিল যে, সে ক্লাসে বসে বসে বক্তৃতা দেয়, যা সিলেবাসে নেই তাই নিয়ে আলোচনা করে, ক্লাস নিতে নিতে পঞ্চাশবার গলা ঝাড়ে, রুমালে নাক মোছে, সর্দি নিয়ে তেমন বেকায়দায় পড়লে বাথরুমে চলে যায় ইত্যাদি।

ওদিকে নেট উত্তির্ণ হওয়ায় গবেষণার সুবিধা হলেও চাকরিটা পাকা হচ্ছিল না। শিক্ষার্থীদের সেই নালিশ জানানোর পর থেকে বলাকার ক্লাসের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু বাড়তি ক্লাসের জন্য বাড়তি টাকা পাবে কিনা প্রশ্ন করায় প্রিন্সিপাল এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তবু দ্বিধা ও গোলমালের মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছিল। ওর তরফ থেকে সমস্যা ছিল একটাই কখনও শরীর, কখনও মেয়ের জন্য কামাই করতে হোত। কষ্ট স্বীকার করে যে কলেজে যাবে, কীসের অনুপ্রেরণায়? অনার্সের ছেলেমেয়েরা অতটা বেয়াড়া না হলেও সহযোগিতাও করত না। তাদের তো একই বিষয়ের একাধিক টিউশনি। আর পাসকোর্সের ক্লাসে যাওয়া তো বিভীষিকা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কামাই করলেও সেটা পরের ক্লাসে পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করত আপ্রাণ। তবু ছ'মাসের বেশি টিঁকে থাকা গেল না। সেই সাথে এক ইউনিয়ানবাজ ছোকরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বলাকার সাথে ঘণিষ্ঠতা করার লাগাতার মাস দেড়েক চেষ্টা করে রণে ভঙ্গ দিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ হাতে কাঠি নিয়ে বলাকার পেছনে ওঁৎ পেতে থাকত। ব্যাটা পলসায়েন্স, ফিজিক্সের বুঝিস কী? সেও বিদ্রোহীদের সাথে হাত মেলাল বলাকার নামে প্রিন্সিপালের কান ভারি করতে। এমনকি ঢোলা কুর্তির ওপর ওড়না কেন নেয়নি তাও আলোচনার বিষয়বস্তু করে তুলত।

অধ্যক্ষা এক রাশ অভিযোগ সহ গ্রীষ্মের ছুটির আগে বলাকাকে আর প্রয়োজন নেই জানিয়ে দিলেন। মে মাসের মাঝামাঝি ছুটি। এপ্রিলের মাইনে তখনও দেয়নি। অ্যাকাউন্টস্‌ থেকে দু মাসের জন্য দুটো ভুলভাল বানান লেখা চেক ধরিয়ে দিল। এতদিনেও ওরা বন্দ্যোপাধ্যায় বানানটা ঠিক করে লিখতে পারল না। সংশোধনের জন্য গেলে বলে, এত বিচ্ছিরি পদবি রেখেছেন কেন? ব্যানার্জী লিখতে পারেন না? পদবি কি ও নিজে রেখেছে, না তার বানানটা নিজে ঠিক করেছে? ঈশ্বরচন্দ্র থেকে মমতা সকল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজী বানান যা বলাকারও তাই।

আসলে বলাকা বরের পদবি গুহ ব্যবহার করে না, সেটাই মল্লিকবাবুর আক্রোশের কারণ। বহুবার কটাক্ষ করেছে এই নিয়ে, কুমারীবেলার পদবি রেখে দিলেই কি দেশে নারী স্বাধীনতা চলে আসবে? ফেমিনিজম আসলে একটা শহুরে ব্র্যান্ড যা শিক্ষিত মেয়েরা কাজে লাগায় ইত্যাদি। মনে হয় ভদ্রলোক ইচ্ছা করেই এই ভুলটা করে। স্বামীর পদবি নেয়নি বলে ওর এত গায়ে জ্বালা; কিন্তু বামুনের মেয়ে হয়ে কায়েতের ছেলেকে বিয়ে করেছে বলে কোনও বক্রোক্তি করেনি। সে যদি একেবারে অন্তজ শ্রেণির কাউকে বিয়ে করত, তাহলেও লোকটার একই অভিযোগ থেকে যেত। জাতপাত আর স্বামীর পরিচয় দাঁড়ি পাল্লায় বসালে পুরুষতান্ত্রিক নিক্তিতে স্বামীর গুরুত্বটাই সম্ভবত ভারি প্রতিপন্ন হয়। সেই চেক সংশোধনের জন্য আবার অত দূর ট্রেন, অটো, রিকশা ঠেঙিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হয়নি। অন্য বারের মতো এবারও ব্যাংকে বলে কয়ে ভাউচারে ডিক্লারেশন লিখে চেক জমা দিয়েছে। যে কদিন পড়াত সে কদিন ওষুধ খেয়ে গলায় সাময়িক আরাম হলেও আবার শুরু হোত। তখন আর অল্প মাত্রায় কাজ হতে চাইত না। গলাজ্বালা, নাক জ্বালা, গার্গেল, কোমরে ব্যথা, মেয়েকে নিয়ে রোজকার টানাপোড়েন, নাকে মুখে ভাপ নেওয়া, মনে চাপ নেওয়া ইত্যাদির মিশ্র ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় এমন পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছিল যে চাকরিটা ছেড়েই মনে হল এক গঙ্গা স্থল হল।

এখন সে কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে কথা চালাচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক, বিএসসি পাস কোর্সের জন্য পদার্থবিদ্যার বই লিখতে চায়। বাংলা কবিতা গল্প কি সাহিত্যের বইয়ের খুব একটা কাটতি না হলেও সাধারণত স্কুল কলেজের পুস্তক প্রণেতাদের ভালোই খাতির আছে। তাদের নিজের পয়সা বিনিয়োগ করে বই বার করতে হয় না। কিন্তু বলাকার বেলায় বুঝি সবই উল্টো হয়ে যায়। বই বার করা নিয়েও এক এক জন প্রকাশকের এক এক রকম টালবাহানা। তার পিএইচডি শেষ হওয়ার মুখে। তারও তো একটা ভার আছে। এক হতচ্ছাড়া প্রকাশক মন্তব্য করে, "ওরকম হাজার হাজার পিএইচডি ফ্যা ফ্যা করছে"। এই অপমান হজম করেও আইসিএসই বোর্ডের অষ্টম শ্রেণীর একটা অংক বই আর উচ্চমাধ্যামিকের প্রশ্নোত্তরের গাইড বুক নিয়ে এখনও লড়ে যাচ্ছে। প্রকাশকদের জানায়নি যে তার কলেজের পার্ট টাইমটা গেছে।

জানায়নি নাটকের রিহার্সালের বন্ধুদেরও। দু একটি ছাত্র ছাত্রী ছাড়া বাকিরা সবাই কোথাও না কোথাও চাকরি করে। একজনের ব্যবসা আছে। যারা এখনও পড়ুয়া তাদের স্বপ্ন আছে ভবিষ্যতে কিছু করবে, যারা করে তাদের ব্যস্ততা আছে, আর বলাকার সব খুইয়ে আছে কেবল অসুখ। এই অসুখটাই ওর বিস্বস্ত জীবনসঙ্গী, চিতায় উঠে সহমরণে যাবে। হতভাগাকে যত তাড়াতে চায় কিছুতেই ওকে ছেড়ে নড়বে না। মাঝে মাঝে কেবল আলিঙ্গল শিথিল করে এই যা। মহড়ার সময় ক্লাবঘরটায় দুটো মশা তাড়ানো ধূপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। এখানে মাস দেড়েক ধরে এসেও এখনও কোনও চরিত্র পায়নি, একদিনও বলাকাকে কিছু পড়ে শোনাতে বা আবৃত্তি করতেও বলা হয়নি। সামনে একটা কল শো, তারও জোরদার প্রস্তুতি চলছে। তারপর হয়তো হবে; এটুকু ধৈর্য তো রাখতেই হবে। কিন্তু যেটা হাতেনাতে পাওয়া গেল সেটা হল মশা মারা ধূপের বিষাক্ত ধোঁয়ায় অবর্ণনীয় নাক গলা জ্বালা আর মাথা ব্যথা। শীর্ষকে লুকিয়ে আবার অ্যান্টিবায়োটিকের পাশাপাশি স্টেরয়েডও খাচ্ছে। সাধারণত এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলে ঠান্ডা বা দুষণ কোনওটাই কুপোকাত করতে পারে না, কিন্তু মশার ধূপ!? সব দুষণ বারবার, কচ্ছপের কামড় একবার।

কলেজ স্ট্রিট থেকে শিয়ালদায় আসার সময় ঠিক করেনি বালিগঞ্জের মহড়ায় যাবে না নৈহাটির বাড়িতে। গলার জ্বালা আর কোমরের যন্ত্রণা বলল নৈহাটি লোকাল ধরে বাড়ি। এই যন্ত্রণাটা শুরু হয়েছে হিয়া হওয়ার পর থেকে। কোমরের কাছে শিরদাঁড়ায় ইনজেকশন দিয়ে রিজিওনাল অ্যানেস্থেশিয়া করা হয়েছিল সিজারের আগে। বাপরে! জ্ঞান সম্পূর্ণ হারায়নি কিন্তু মাথাটা একেবারে পেগলে গিয়েছিল।

"আপনি কিন্তু ছুরি চালাবেন না। আমি সব টের পাচ্ছি।"

"আমারা কি খুনি যে ছুরি চালাব? এটা স্ক্যালপেল। ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। আপনি টেরই পাবেন না। আগে দেখি বাচ্চার মাথাটা কোন দিকে।"

"কিন্তু আপনি যে পেটে চাপ দিচ্ছেন সেটা বেশ বুঝতে পারছি। এখন পেট কাটবেন না কিন্তু।"

"বুঝতে পারছেন? বেশ বাঁ পাটা তুলুন দেখি।"

পা তুলবে কী, বলাকা নিজের ডান বাঁ কোনও পাই খুঁজে পায়নি।

ওর শরীরের লক্ষণ দেখে অনেকেই বলেছিল ছেলে হবে। মনটা খুব উৎফুল্ল ছিল না তাই। রাস্তাঘাটে বাচ্চাদের পোষাকের সম্ভার দেখলে চোখটা মেয়েদের পোষাকের দিকেই টানত। ওটি-তে ডাক্তারের মুখে মেয়ে হয়েছে শুনে বলাকা তাকে এমন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে "থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ" করেছিল যেন কৃতিত্বটা বরের নয় ডাক্তারের। তারপর শুরু হল মাথায় বর্ণনাতীত যন্ত্রণা। টানা সাত দিন প্রচণ্ড বমিভাবের সঙ্গে মাথা যন্ত্রণা। অ্যানেস্থেশিয়ার পার্শ প্রতিক্রিয়া। কাটা তলপেটে চাড় পড়ত বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারত না। মেয়েটাকে দুধ খাওয়ানোটা তো মনে হোত শাস্তি। ওহ! ফুকলি মাড়ির কামড়ে যা যন্ত্রণা দিত তার বাবা বত্রিশ পাটি নিয়েও কোনও দিন তা দেয়নি। আবার কিছুক্ষণ বিরতি পেলেও বুকে দুধ জমে টনটন করত। সেই সাথে প্রথম চব্বিশ পঁচিশ দিন ধরে সেই ব্যাপারটা তো ছিলই, ঘষা খেয়ে কোমর উরু সব ছিঁড়ে যেত। যে সব পণ্ডিতরা বলে নিয়মিত রক্ষপাতের ফলে মেয়েরা নাকি কম অসুখে ভোগে তারা ডাঁহা মিথ্যে কথা বলে। নিয়মিত ক্ষরণটাই তো মস্ত অভিশাপ, সেই নিয়েও গাইনিদের চেম্বারে ভিড় উপচে পড়ে। আর তা সত্ত্বেও সব ধরণের ডাক্তারের চেম্বারে দেখেছে মহিলা রোগীরই ভিড় বেশি। হৃদয়ঘটিত হোক বা বৃক্কজনিত। আর হাড়ের অসুখে তো একচেটিয়া মেয়েদের রাজত্ব। কে জানে, প্রথম ছ'মাস বুকের দুধ ছাড়া বাচ্চাকে জলস্পর্শ করানো যাবে না সেটাও যেন পুরুষবাদী ষড়যন্ত্র মনে হয়।

শীর্ষ ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, "হিয়া কোথায়?"

"আজকে আনতে পারিনি ওবাড়ি থেকে। কোমরে যন্ত্রণার জন্য হট ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে শুয়ে আছি।"

"আমি নিয়ে আসছি। এক্সারসাইজ করবে না, কেবল বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো অসুখ বিসুখ উদ্‌যাপন করে যাবে। পেইন কিলার আনতে হবে? আর অ্যান্টাসিড আছে না আনব?"

"মেয়ে তো ক'দিন আগে পর্যন্ত রোজই দাদু দিদার কাছে থাকত। আজও নয় রইল।"

"এই অসুখ অসুখ বাই তোমার একটা ম্যানিয়া। দিব্যি বিছানায় গড়িয়ে আরাম করে নাও। আমার শরীর অশরীর থাকতে নেই?"

বলাকার চাকরি যাওয়ার পর শীর্ষ আর অদরকারে শ্বশুরবাড়ির ওপর নির্ভর করতে চায় না। তাছাড়া সারা দিন অফিস করার পর রাতে মেয়েকে পাশে চাইই। রাত নটার সময় তিন কিলোমিটার দুরে বাইক নিয়ে কন্যাকে আনতে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে দরজা ঘণ্টিতে টিংটং। শীর্ষ।

"কী হল? গেলে না?"

"পেটটা সকালে ঠিক ..."

শীর্ষ ঘাড়ে তোয়ালে নিয়ে স্নানঘরে ঢুকে গেল। একেবারে গা ধুয়ে বেরিয়ে এসে দেখল রাত সাড়ে নটা। নাহ! রাত দশটার সময় দাদু-দিদার কাছ থেকে মেয়েকে নিয়ে আসা বাড়াবাড়ি কেন অসভ্যতা হয়ে যাবে। ওখানে থাকতে হিয়া ভালোইবাসে।

"দিনে পাঁচবার করে মধুপুর যাওয়া তোমার ম্যানিয়া নয়?"

"সেটা পেট পরিস্কারের ম্যানিয়া, তোমার মতো পাঁচ দিন পেটে হাগু পুষে রাখার চেয়ে ভালো। ছি ছি! এত পরিচ্ছন্নতার বাই, পিটপিটিনি, আর পেটের মধ্যে ময়লা জমিয়ে রাখতে ঘেন্না করে না?"

"পাঁচ দিন মোটেই না। দু-তিন দিন হয়ে যায়।"

"রোজ সকালে একটু উষ্ণ জল খেয়ে যথাস্থানে গিয়ে বসবে, ঠিক হবে।"

"ঠিক মতো বেগ না এলে বসেও লাভ হয় না। এমনিই বেরিয়ে আসতে হয়।"

"রোজ একটা নির্দিষ্ট সময় বসার অভ্যেসটা কি করেছ? যতক্ষণ না বেরিয়ে আসার উপক্রম হচ্ছে ততক্ষণ বাথরুমে যাবে না আর এক একটা প্রাণঘাতিকা হিউম্যান বম্ব ছাড়বে। এমন পাদুরে মহিলা কোথাও দেখিনি। তোমার স্টুডেন্টরা নির্ঘাৎ শুনে কিংবা শুঁকে ফেলেছে। দেখবে যাও এটাও গিয়ে প্রিন্সিপালকে গিয়ে লাগিয়েছে হয়তো।"

৫

কেরালা বেড়াতে যাওয়া সব ব্যবস্থা হয়ে রয়েছে। বলাকার মা বাবা দাদা বৌদিও ও ভাইপোও সঙ্গে যাবে। ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে ছয়জন বড়ো ও দুটো বাচ্চার জন্য পুরো প্যাকেজ বুকিংটা বলাকাই করেছে। যাক চাকরি না থাকার একটা সুবিধা পাওয়া গেছে। শীর্ষর সময় হচ্ছিল না, রন্তিদা মানে বলাকার দাদার ভাবটা এমন যেন গিয়ে উদ্ধার করে দিচ্ছেন। এই যাচ্ছি যাচ্ছি সময়টাই যেন বেশি উপভোগ্য।

"হ্যালো।"

"এই শোনো না, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।"

"বলে ফেল। কাণ্ড তো তুমি রোজই বাধাও।"

"বাড়িতে ট্যাঙরা মাছ বিক্রি করতে এসেছিল। ছোট ছোট মাছ। ব্যাটা কিছুতেই বেছে দিল না। আমি বঁটিতে কাটতে গিয়ে সামনের একটা দাঁড়া বুড়ো আঙুলে ঢুকে গেছে। ওটা টেনে বার করতে গেলে মর্মান্তিক লাগছে। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। পাশের ফ্ল্যাটের দীপুদের বলতে গেলাম, ওরা কেউ বাড়ি নেই। খোকনের ওষুদের দোকানে গেলাম, ওরা বলল হাসপাতালে যেতে। এমন আড়ে কাটে বেধেছে টানাটানি করলে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ার গায়ে অসংখ্য কাঁটা কাঁটা, রাক্ষস খোক্ষসদের কাঁটাওয়ালা মুগুরের মতো। টানা যাচ্ছে না।"

"দু'দিন পরে বাইরে যাব। তোমাকে এখন ট্যাংরা মাছ কিনতে কে বলল? আমি বাইরে যাওয়ার আগে বেশি বাজার করে ফেললে কথা শোনাও, নিজে হঠাৎ মাছ কিনতে গেলে কেন? ফ্রীজে তো মাংস রয়েছে। আর কিনলেই যদি অমলাকে বললে না কেন, সে কেটে দিত?"

"অমলা বলল সে ট্যাংরা কাটতে বাছতে পারবে না। তাছাড়া ওর চলে যাওয়ার ঠিক আগেটাতেই মাছওয়ালা এসেছিল। আমার কিন্তু খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি বকে যাবে না কিছু ব্যবস্থা করবে? দাঁড়া ফোটা গোটা মাছটা এখনও আমার হাতে, উঃ!"

"একটা রিপোর্টে একটু গন্ডোগোল আছে, ওটা ঠিক করে একটা ফ্যাক্স পাঠাতে হবে হেড অফিসে। তারপর বেরোচ্ছি। টিটেনাস নিতে হবে তো। ওষুধের দোকানে গিয়েছিলে বুদ্ধি করে একটা টেডভ্যাক তো নেবে। হাজারটা ওষুধের নাম জান নিজে নিজে ডাক্তারি ফলাও, আর এটুকু বুদ্ধি হোল না?"

"আমার যন্ত্রণায় গা বমি দিচ্ছে মাথা ঘুরছে। আমি রোদের মধ্যে আর একা একা বেরোতে পারছি না। যদি আসতে পারো তো এসো, না হলে আমি ধনুষ্টংকারে বেঁকে যাই। মাকে ফোন করে দিচ্ছি, হিয়া আজ ওখানেই থাকবে"।

হাত পেকে ফুলে বলাকার জ্বর এসে এমন অবস্থা যাওয়াটা শেষ মুহূর্তে বাতিল করতে হল। যাত্রার সমসমকালে মাত্র পঁচিশ শতাংশ টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। শীর্ষ আর বলাকা মা-বাবা দাদা-বৌদিকে বলেছিল অন্তত ওঁরা যেন ঘুরে আসেন। কিন্তু মেয়ে বা বোনকে এমন অবস্থায় ফেলে বেড়াতে যেতে মন চায়? চক্ষুলজ্জাতেও বাধে। আর দাদাভাই বেড়াতে যাবে হিয়াকে ফেলে? সামলানো যাবে মেয়েকে? বাচ্চাদুটো অবশ্য হতাশ হলেও এক সাথে খেলতে পেলেই খুশি।

মাত্র কয়েকটা আর্ন লিভের সঙ্গে বড়োদিনের ছুটি শনি রবি মিলিয়ে বেশ সুবিধা হয়েছিল এবার। অসুখ যদি না করে তো দুর্ঘটনা ডেকে আনতে হবে? অফিসে আজ একটু খিটখিটে মেজাজে শীর্ষ। দপ্তরে শীর্ষের রুগ্ন বৌয়ের ভালোই পাবলিসিটি আছে,কয়েকজন সহকর্মী মাঝে মাঝেই আওয়াজ দেয়। কোনও দিন একটু আগেভাগে বেরোলেই প্রশ্ন করে, "কী গুহদা বৌদির আবার কিছু হয়েছে?" সেই সাথে হাজারো পরামর্শ তো আছেই। কলকাতা, মুম্বাই, ভেলোর, ব্যাঙ্গালোর, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, হাকিমি, ইউনানি, জ্যোতিষী, যোগাসন, রামদেব, কামদেব.. কত কী! এবারের টপিক অসুখ নয়, অ্যাক্সিডেন্ট। সত্যি শীর্ষ গুহর বৌ পারেও বটে, কোনও কিছু বাধাতে পারেনি তো হাতে ট্যাংরার কাঁটা ফুটিয়ে বরকে ফোন করছে। শীর্ষদাও কম যায় না; কোষ্ঠ পরিস্কার রাখার আন্তরিকতার জন্য তাকে অনেকেই আড়ালে গুহদার বদলে হাগুদা বলে উল্লেখ করে। এই সূত্রে কার বৌয়ের, কার ছেলের, কার মেয়ের, মা, বাবা, শালা, শালি, দেওর জা, শ্বশুর শ্বাশুড়ির কী কী অসুখ, কে কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছে, কে পঙ্গু হয়ে গেছে, কে বড়ো ফাঁড়া থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে – তার জমজমাট আড্ডা বসে গেছে পাশে অমর দত্তর টেবিল ঘিরে। সেই থেকে কার সাথে কার কী লটরঘটর চলছে, তাই নিয়ে কার সংসারে কত অশান্তি সেই আলোচনাও বাদ থাকছে না।

শীর্ষ বিরক্ত গলায় বলল, "আঃ, দত্তদা আপনাদের কি আর কোনও আলোচনা নেই? অফিসে কিছু লোক গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘোরে বলেই আমাদের কয়েকজনকে ঘাড় গুঁজে কাজ করে যেতে হয়। আমার বৌ আমার জ্বালা। আমাকে এই নিয়েই সারা জীবন জ্বলতে হবে।"

"তুমি আর কী জ্বলছ ভায়া? চট্টোরাজকে দ্যাখো, দেখে শেখো। বেচারার বৌ পরকিয়ায় লেঙ্গি খেয়ে ডিপ্রেশনে ভুগছে বলে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।"

কথাগুলো কিছুটা টনিকের কাজ করল। খিটখিটে ভাবটা চলে গিয়ে এক ধরণের প্রশান্তি। মোবাইল তুলে বলাকাকে ফোন করল শীর্ষ, "হ্যালো। শরীর কেমন? আর মন? ভাবছি কেরালা হল না তো কী, হাতটা সারলে সবাই মিলে একটা গাড়ি বুক করে শঙ্করপুর কি মন্দারমণি ঘুরে আসি।"

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ মামাবাড়ির শহর মেদিনীপুরে, আর পৈতৃক বসবাস সূত্রে শেকড় পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার ডিশেরগড় খনি অঞ্চলে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (রসায়ন), বিএড, এমবিএ-র পর কর্মজীবন শুরু একটি ফার্মাসিউটিকল কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসাবে। পেশাজীবনে অনেক আলো-আঁধারি পেরিয়ে ২০১০ সাল থেকে লেখালিখির জগতে থিতু। বর্তমানে একাধিক বাণিজ্যিক-অবাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটদের গল্প, ছড়া, ফিচার, সমালোচনা ইত্যাদি রচনায় নিয়মিত। কয়েকটি ওয়েবসাইটে ফ্রিল্যান্স কনটেন্টও লিখেছেন। কবিতা দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও গদ্যসাহিত্যে ব্যাপ্তি অধিকতর। গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ শ্রীপর্ণার অন্যতম অনুরাগ ও দায়বদ্ধতার জায়গা। তবে এযাবৎ সাহিত্য-স্বীকৃতিগুলি এসেছে মূলত ছোটগল্পের জন্যই। স্বীকৃতি বলতে – বঙ্গ সংস্কৃতি পুরস্কার ২০১২, ঋতবাক 'এসো গল্প লিখি পুরস্কার' ২০১৬-১৭, শর্মিলা ঘোষ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬ (গল্প), উষা ভট্টাচার্য স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৮, নবপ্রভাত রজতজয়ন্তী বর্ষ সাহিত্য সম্মাননা ২০১৮ (গল্পগ্রন্থ)।

ধারাবাহিক উপন্যাস

সৌমিত্র চক্রবর্তী

সময়

পর্ব ৪

রাস্তায় পা দিতেই অন্ধকারটা যেন ঘিরে ধরল। অন্ধকার এমন গাঢ় হলে নীলের মনে হয় যেন আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে পৃথিবী। এই সময়ে একটুও শব্দ করা উচিত নয়, তাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। আকাশে মেঘ আছে টের পাওয়া যাচ্ছে এ অন্ধকারেও। লালচে একটা রঙ আকাশ জুড়ে। নীল শিঞ্জিনির দিকে চোখ ফেরালো। চোখ তুলে মেঘ দেখছে মেয়েটাও। একটা অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ আসছে। শিঞ্জিনির চুল থেকে কি ? নীলের মনে হল এই অন্ধকার পথ, মন্ত্রমুগ্ধ করে দেওয়ার দৃষ্টিসম্পন্না এক যুবতী আর তার চুলের অপার্থিব ঘ্রাণ – সব মিলিয়ে সময় যেন এক রূপকথা বুনে চলেছে এই মুহূর্তে।

শিঞ্জিনি মেঘের দিকে তাকিয়েছিল। বলা ভালো মেঘের আড়ালে বুকজোড়া বিস্ময় গচ্ছিত রাখবার চেষ্টা চালাচ্ছিল সে। এখনও তার মাথায় ঢুকছেনা এ'কিভাবে সম্ভব ? স্বপ্ন কবিতা হতে পারে, কিন্তু বাস্তব হয়ে পাশাপাশি পথ চলতেও পারে কি ? ছিপছিপে, সুশ্রী তরুণটির পায়ে পা মেলাতে জড়িয়ে মড়িয়ে যায় তার অনুভূতির দল। – "চলুন, এগোই", নীলের মৃদু ডাকে সম্বিত ফেরে শিঞ্জিনির।

পথজোড়া অন্ধকার, তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকে সদ্যপরিচিত দুই তরুণ তরুণী, মাথা নীচু করে। কোনও কথা নয়, চলনে নয় কোনও দ্রুততা, যেন একটু একটু করে তারা এগিয়ে চলেছে আলোকসন্ধানে।

হঠাৎ একটা দলবদ্ধ চিৎকার কানে এল। কারা যেন অশ্রাব্য ভাষায় চিরে দিচ্ছে অন্ধকারের বুক। দাঁড়িয়ে পড়ে দুজনেই। অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়। পায়ের শব্দ স্পষ্টতর হতে বোঝা গেল গন্ডগোলটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। – "কি হল বলুন তো ?"। প্রশ্নটার কোনও উত্তর না দিয়ে শিঞ্জিনির বাঁ হাতে এক হ্যাঁচকা টান মেরে পাশের সরু গলিটায় ঢুকে পড়ে নীল। – "মনে হয় আবার শুরু হয়েছে ঝামেলাটা", চাপা স্বরে বলে ওঠে সে। বলতে বলতে দুটো ছেলে হুড়মুড়িয়ে ছুটে যায় সেই জায়গাটা মাড়িয়ে যেখানে কয়েক মুহূর্ত আগেও দাঁড়িয়েছিল তারা। পেছন পেছন আরও আট দশটা ছেলে। তাদের মধ্যে একজনের হাতে এই অন্ধকারেও ঝকঝক করে ওঠে ইস্পাতের ফলা।

"এই রাস্তাটা ধরা ঠিক হবেনা এখন। তারচেয়ে গলিটা দিয়ে এগিয়ে যাই চলুন, দেখি কোথায় শেষ হয়েছে", কথাগুলো বলেই পা বাড়াতে গিয়ে নীল বোঝে শিঞ্জিনি স্থির হয়ে রয়েছে। ও হো ! উত্তেজনার চোটে এখনও মেয়েটার বাঁ হাত ধরে আছে সে। নীল লজ্জা পেয়ে চট করে হাত ছেড়ে দেয়। তারপর দ্রুত গলি ধরে চলতে থাকে দুজন।

গলিটা বড় নয় খুব একটা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই যে বড় রাস্তায় এসে মিশল, সেটার নাম জানে নীল – রায় বাহাদুর রোড। সোহম আগে থাকত এখানে, তখন সে বারকয়েক এসেছে এ রাস্তায়। নীল এবার দোটানায় পড়ে যায়। বাঁদিকে একটু গেলেই ডায়মন্ড হারবার রোড। ওদিক দিয়ে যাবে কি ? তাহলে তো আবার তারাতলা পেরোতে হবে যেখানে মূল ঝামেলাটা ঘটেছে। ডানদিকে গেলে অবশ্য টালিগঞ্জের দিকে যাওয়া যায়। তাতে মেট্রোটা পেয়ে যাবে। কিন্তু টালিগঞ্জ অবধি যাবে কিসে ? বাস-টাস তো কিছু চলছে বলে মনে হচ্ছেনা। একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে ওপারটায়। শিঞ্জিনি লক্ষ করেছে সেটা। – "ট্যাক্সিতে গেলে হয়না ?", সে প্রস্তাব পাড়ে। নীল ভাবতে সময় নেয়। একটা অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে এভাবে ট্যাক্সিতে....., তাছাড়া আজ নীল তেমন টাকা নিয়েও বেরোয়নি আসলে। "আমার কাছে টাকা আছে কিন্তু। ভাববেননা"। নীল লজ্জায় পড়ে যায়। ছি ছি মেয়েটা বুঝতে পেরে গেছে তার পকেটের অবস্থা।

ট্যাক্সিটা পেয়ে একটা বড় সুবিধা হয়ে যায় দুজনের। হাতিবাগানের ট্যাক্সি হওয়ায় পুরোটাই যেতে রাজী হয়ে যায়। ঠিক হয় শ্যামবাজার মোড় অবধি চলে যাবে তারা। তারপর শিঞ্জিনি বাস ধরে নেবে আর নীলের তো পায়ে হাঁটাপথ। সারা রাস্তা চুপচাপ পার করে দুজনে। যেন একরাশ সংকোচ মাঝখানে বসে দুজনকে ঠেলে দিয়েছে দুটো জানলার ধারে। শ্যামবাজারে এসে ট্যাক্সিভাড়া মিটিয়ে দেয় শিঞ্জিনি। – "পরশু তাহলে বারোটা নাগাদ ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে", নীল ছুঁড়ে দেয় শব্দগুলো। – "হুঁ", বাস এসে যায় শিঞ্জিনির।

বাকি পথটা পায়ে ভাঙতে ভাঙতে নীল একমনে শিঞ্জিনির কথা ভাবতে থাকে। এই রে ! স্যারের দেওয়া চিঠিটা কোথায় রাখল ? বুকপকেটে তো নেই। নীল জিনসের দু পকেট থাবড়াতে থাকে। এই যে, ডান পকেটে কি যেন খড়খড় করছে। হাত ঢোকাতেই বেরিয়ে আসে চিঠিটা, সঙ্গে দুটো একশো টাকার নোট। এ দুটো কোত্থেকে এল ? ও হো ! মা দিয়েছিল বাবার ওষুধ কিনতে। ধ্যাত ! কোনও মানে হয় ! মনেই ছিলনা একদম। তাহলে ট্যাক্সিভাড়াটা অনায়াসে সে-ই দিয়ে দিতে পারত। মেয়েটা কি ভাবল ! ভাবল, কি ছেলে রে বাবা, কাছে এটুকু টাকাও রাখেনা। নিজের বেখেয়ালীপনার ওপর নিজেই বিরক্ত হয়ে যায় নীল। ঠাকুমাই ঠিক নামে ডাকত তাকে – ন্যালাখ্যাপা !

(চলবে)

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল

খাওয়ানো

পর্ব ৯

স্ত্রী গেছেন জনৈকা সন্তানসম্ভবার সাধপূরণ করতে অর্থাৎ কিনা সাধ খেতে। আমার আড়াই বছরের কন্যার মধ্যাহ্নভোজনের দায়িত্ব পড়েছে আমার ঘাড়ে। আমার মেয়ের পছন্দের খাদ্যতালিকা সম্বন্ধে বলি। আমার স্থিরবিশ্বাস আমার মেয়ে পূর্বজন্মে সাধু সন্নিসী ছিল। স্বাত্তিক খাবারেই তার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। স্বাত্তিক খাবার বলতে আমি যা বুঝি সেটা হল দুধ, ফলমূলাদি ইত্যাদি। রজোগুণী খাবার বলতে আমি বুঝি যে খাবার খেলে কাজ করবার শক্তি পাওয়া যায় যেমন ভাত, ডাল ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাবার। আর তমোগুণী খাবার মানে অবশ্যই প্রাণীজাত প্রোটিন অর্থাৎ মাংস – মুরগী অথবা মাটন। স্বাত্তিক খাবারে ওর আগ্রহ প্রবল। এক বাটি স্ট্রবেরী কি ব্লুবেরী, কলা হোক আপেল হোক চোখের নিমেষে সাবাড় করে দেবে। এক কাপ দুধ উড়িয়ে দেবে পলক ফেলার আগেই। রাজসিক খাবারে অর্থাৎ ভাত ডালে বিশেষ বিরক্তি আর চিকেন মাটনে যেটা আছে সেটা যারপরনাই ঘৃণা বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু শিশু বিশেষজ্ঞরা শুধু ওই তথাকথিত স্বাত্তিক খাবারে শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টি হয় বলে মনে করে না। তাই সকাল সন্ধ্যে আমাদের ওই রাজসিক ও তামসিক খাবার খাওয়ানোর অ্যাডভেঞ্চারে নামতে হয়। অ্যাডভেঞ্চার কথাটা কেন ব্যবহার করলাম সেটার জন্য একটু বিশদে যাওয়া প্রয়োজন। তো যা বলছিলাম লাঞ্চ করানোর দায়িত্ব আমার ওপরে আজ। তামসিক খাবারের রিস্ক না নিয়ে কম বিপজ্জনক রাজসিক খাবারেরই ব্যবস্থা করে গেছে স্ত্রী। অর্থাৎ ভাত, মুসুরের ডাল, আলু সেদ্ধ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি শাকসবজি স্বাত্তিক খাবারের মধ্যে পড়লেও তাতে ওর মোটেই আকর্ষণ নেই। তাই সবজি আজকের ওর মেনু থেকে বাদ। একটু স্বাত্তিক টাচ দেওয়ার জন্য ভাত ডাল আলুসেদ্ধর সাথে বেশ বড় চামচের এক চামচ ঘি চটকে মেখেছি। এর পরের ঘটনা নিম্নরূপ।

একটা বড় নিঃশ্বাস নিলাম। ইস্ট দেবতাকে একটু স্মরণ করে নিলাম। নিজেকে ভগবান বুদ্ধের মত প্রশান্ত চিত্ত করতে কল্পনা করলাম সবুজ কচি ঘাসে ভরা একটা মাঠে চলে গেছি। পাশ দিয়ে উপলখণ্ডের মধ্য দিয়ে ঝিরিঝিরি করে বয়ে চলেছে একটা নাম-না-জানা নদী। পাখিদের কুহুকাকলিতে মুখর পরিবেশ। প্রিয় কবিদের প্রিয় কবিতা স্মরণ করি। ইত্যাদি বিভিন্ন রকম মানসিক যোগাসন করে গলার স্বরের মধ্যে যথেষ্ট চিনি এবং উত্তেজনা, উৎসাহ ভরে ডাকলাম "সানাই। এবার আমরা ভাতু খাব। ইয়েয়ে... ইয়ামি..." ভাতের থালা নিয়ে ওর দিকে এগোতেই আমার কৃত্রিম উৎসাহে জল ঢেলে উল্টোদিকে ছুটল। আমি যে ইয়ামি খাবার দিচ্ছি এমনটা আর মনে হয় না। আত্মবিশ্বাসে সামান্য একটু চিড়। ভাতের থালাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে হাসি হাসি মুখ করে ঘরের মধ্যে খানিক ছোটাছুটি করে বেড়ালছানার মত প্রাণীটাকে বগলদাবা করে নিয়ে এসে বসলাম সোফায়। নাহ, চাপ আছে। সোফিয়া চালিয়ে দিই। ওর প্রিয় রাজকুমারীর বিভিন্ন অভিযান দেখতে দেখতে নিশ্চয়ই খেয়ে নেবে। সোফিয়ার মিষ্টি গলার স্বরে ওর মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। গুড সাইন। এক চামচ ভাত-ডাল-আলুসেদ্ধ-ঘি মুখে চালান করে দিলাম। সোফিয়াকে দেখতে দেখতে বেশ উৎসাহের সঙ্গে মুখে নিলো গ্রাসটা। স্বস্তি। ওর মা ফালতুই বলে "মেয়েটা একদম খায় না।" এই তো বেশ খেয়ে নিচ্ছে। আসলে ওরা বাচ্চা হ্যান্ডল করতেই জানে না। আর মাত্র নটা মোটে চামচ। খাওয়াতে পারলেই পড়া শুরু করতে পারব সলমন রুশদির অর্ধসমাপ্ত উপন্যাসটা। মিনিট পাঁচেক পরে দ্বিতীয় চামচটা নিলাম। সানাইয়ের দিকে বাড়াতেই খুব উৎসাহের সঙ্গে মুখ খুলে দিল। যাক আজ চাপ দিচ্ছে না। ও হরি। মুখের মধ্যে প্রথম চামচের প্রায় অর্ধেকটা এখনও নিজগুণে বিরাজমান। শিশুদের এই একটা দৈব ক্ষমতা। আমাদের মুখের মধ্যে খাবার গেলেই স্যালিভা সিক্রেশান হয়, লালাক্ষরণ হয়। ওরা কোন এক ম্যাজিকাল পাওয়ার থেকে সেইটে বন্ধ করতে পারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটাই গ্রাস মুখে নিয়ে বসে থাকতে পারে। শিশুদেরকে ভগবানের অংশ এমনি এমনি বলে না। যাকগে যাক আধ

চামচ তো খেয়েছে। দ্বিতীয় চামচ খাবারটাকে কমিয়ে অর্ধেক চামচ করি। মুখে ভরে দিতেই মুখবিবর পুরো ভর্তি। গালগুলো ব্যাঙের মত ফুলে আছে। চিবোনোর কোন লক্ষণ দেখি না। সোফিয়া ততক্ষণে কিছু মৎস্যকন্যাকে নিজের বার্থডে পার্টিতে নেমন্তন্ন করে ফেলছে। সেইটেই চোখ দিয়ে গিলছে। খাবার গলাধঃকরণ করার তেমন কোন ইচ্ছে নেই। অগত্যা পরের সাত মিনিট সোফিয়ার কার্যকলাপ দেখি ওর সাথে। প্রসঙ্গত সোফিয়ার সব কটা এপিসোড একশ আট বার আমার সামনে প্লে হয়ে গেছে। প্রতিটা গল্প শুরু থেকে শেষ অব্দি জানি। এখন ডায়ালগগুলো পর্যন্ত মুখস্ত হতে শুরু করেছে। কিন্তু সানাইয়ের কোন ক্লান্তি নেই। মাঝে মাঝে ভাবি ওর মত ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা যদি আমার হত, প্রতিদিনই নতুন করে পৃথিবীটাকে দেখতে পারতাম, চোখে একই বিস্ময় নিয়ে উপভোগ করতে পারতাম সূর্যোদয় কি সূর্যাস্ত গুলোকে, কি ভালই না হত? স্মৃতি বড় বিস্ময়-প্রতিরোধক। আবার পাঁচ মিনিট পরে আবার এক চামচ ভাত নিয়ে মুখ খুলতে বলতেই খুলে দেয় সে। এ ব্যাপারে ও বড় বাধ্য। একেবারেই ঝামেলা করে না। মুস্কিল হল এবারে শুধু দেখি মুখটা তিন ভাগ্যের চার ভাগ ভর্তি। আগের গ্রাসের কিছুই প্রায় শেষ করে নি। "সানাই খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। অল ডান করতে হবে। ফিনিশ করতে হবে। ফাস্ট" বলে আবার অপেক্ষা। না কোন কাজ হয় নি। মুখ নড়ে না। যথাযথ কারণেই গলার ওজন বাড়ে। "সানাইইইই। খাওওও"। ঠোঁট ফুলে ওঠে। কান্নার প্রস্তুতি। কিন্তু গালের পেশীগুলো তথৈবচ। নো নড়নচড়ন। গলা নামিয়ে "খেয়ে নাও সানাই। ওদিকে মিয়া সব খেয়ে নিলো"। মুখ চলে সামান্য। দু তিন সেকেন্ডের মত। তারপরেই মিয়ার সাথে প্রতিযোগিতা বুঝি ভুলে গেল। আবার বলি "সানাই পিকু সব খেয়ে নিলো।" – এ বারে মুখ আর চললই না। বোঝা যাচ্ছে মিয়া বা পিকুদের সাথে খাওয়ার স্পীডের ইঁদুর দৌড়ে সামিল হবে না। এসবের উর্ধে চলে গেছে। খাওয়ানো শুরু করার আগে মনের মধ্যে যে ঝিরি ঝিরি নদীটা বইয়েছিলাম এখন তার জলটা বেশ ঘোলা লাগছে। অপেক্ষা। অপেক্ষার থেকে ভাল বন্ধু আর কিছু নেই মনকে বোঝাই। আর খানিকক্ষণ পরে যখন দেখলাম দ্বিতীয় চামচ প্রায় শেষের মুখে, (মানে জিভের ওপর ভাতের একটা বেস আছেই, সে থাক অত বেশী আশা করলে চলে না) তৃতীয় চামচটা চালান করে দিই মুখে। নেয় কিন্তু নতুন আসাইন্মেন্টের ওপর কাজ শুরু করে না। এই লক্ষণ আমি বিলক্ষণ চিনি। আমাদের সরকারী অফিসের মত। ফাইল আসে কিন্তু প্রসেস হয় না। মিঠে কথায় আর কাজ হবে না মনে করে কিছু কাল্পনিক চরিত্রকে নিয়োগ করি। "পুলিশ, পুলিশ আছ তো? সানাই খাচ্ছে না। ও তোমরা আসছ? আচ্ছা দাঁড়াও। সানাই বোধ হয় খেয়ে নেবে" – ফোনে কাল্পনিক পুলিশের সাথে আমার কথোপকথন। ওর স্নায়ুশক্তির প্রশংসা করতেই হচ্ছে। পুলিশের নাম শুনে হৃৎকম্প তো দূরের কথা, মুখে চিন্তার রেশ মাত্র দেখা যায় না। যেই কে সেই ট্যাঁটা হয়ে বসে থাকে। "ওকে, তাহলে হাঁকার মাকে ডাকি? ডাকবো তো?" সেই খুদে লৌহস্নায়ু প্রাণীটিকে প্রশ্ন আমার। মুখ ভর্তি ভাত নিয়ে একটা দুর্বোধ্য শব্দ করে। অর্থ বোধ হয় ডাকতে মানা করছে। আজকাল এটাতে একটু কাজ হচ্ছে। কিন্তু সামান্যই। শীঘ্রই নতুন কোন চরিত্রকে আনতে হবে। তিনচারবার মুখ নাড়া আওয়াজ পাওয়া যায়। ক্রমে ধীর হয়ে আসে। আবার সানাই সোফিয়ার দেশে হারিয়ে যাচ্ছে। গোরু একটা ! নদীর ঘোলা জলটা এখন নর্দমার জলের মত কর্দমাক্ত লাগে। পাখি নয়, শেয়ালের আর প্যাঁচার ডাক শুনতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে। নাহ। Calm down. Calm down. Peace. ওম মধু, ওম মধু, ওম মধু। মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মনে মনে শান্তি মন্ত্র আওড়াই। আমি বিশ্বশান্তির বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি। Peace noble টা আমার লাগল বলে – এইসব ভাবি। আবার বড় করে শ্বাস নিই। "সানাই সোফিয়া কি করছে? ও সোফিয়া ফ্লায়িং? উড়ছে?" উৎসাহের সাথে জিগ্যেস করি। বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে। মুখভর্তি খাবারের অলিগলি পথে একটা হ্যাঁ বলারও চেষ্টা করে। "গুড। খেয়ে নাও। খেয়ে নাও। নয়তো সোফিয়া রাগ করবে।" মাথা নাড়া বন্ধ। সাথে মুখ চালানো। বোঝাই যাচ্ছে সোফিয়ার প্রতি ওর কোন সহানুভুতি নেই। না থাকুক, বাবার ওপর তো থাকবে। "সানাই, বাবার খুব খিদে পেয়েছে। বাবা কাঁদছে।" একটু কুমীর কান্না কাঁদি। নাহ লাভ হচ্ছে না। বাবার ওপরেও বিশেষ সহানুভুতিশীল নয়। "সোফিয়া বন্ধ করে দেব কিন্তু।" হুমকি ছাড়ি। জোড়ে জোড়ে মাথা নেড়ে অসম্মতি প্রদর্শন করে। কিন্তু কোন চুক্তিতে বা ডীলে আসে না। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের আইডিয়াটা এদের কাছ থেকেই পেয়েছিল কি? কে জানে? ঘড়ির কাঁটা একশ আশি ডিগ্রী ঘুরে গেছে। ওর মুখের বাঁধন অতিক্রম করে খাদ্যনালীতে

খাবার না পৌঁছনর ফলে আমার ধৈর্যের বাঁধন ভাঙছে। মাত্র চার চামচ মত ঠুসতে পেরেছি বলা চলে। পঞ্চমটা নিজের মুখে ভরে দিই। যাক, ও খাওয়া আমি খাওয়া একই ব্যাপার। আফটার অল বাপ মেয়ে তো! ষষ্ঠটা ওর দিকে বাড়াতেই মুখ খুলে দেয়। তৃতীয় আর চতুর্থ চামচ এখনো সেখানে। হাউসফুল। মরিয়া হয়ে তাও ঠুসি। ব্যাস... আমার এই অসৎ কর্মের শাস্তি স্বরূপ গোটা আড়াই চামচ মত নীরবে উদ্গীরণ করে দেয়। সাড়ে চারটে গোল দিয়ে আড়াই খানা গোল খেয়ে আমার স্কোর এখন দুই। মানে দুই চামচ মত খাওয়াতে পেরেছি। সেই ছোটবেলায় বাঁদরের অঙ্ক কষেছিলাম – তেল লাগানো বাঁশে বাঁদর তিন মিটার ওঠে, পরে দু মিটার নামে। এই গল্পে তিন গ্রাস যায়, দু গ্রাস বেড়িয়ে আসে। হতাশা। নাহ সত্যিই খাওয়ানো চাপ ওকে। মনে মনে ওর মাকে সেলাম জানাই। প্রাণপণে চেঁচাই "সানাইইইই"। ব্যাস... ফল স্বরূপ কান্না। মিনিট তিনেক সোফিয়ার শব্দ ছাপিয়ে সেই চিল চিৎকার কর্ণবিবরে ঢোকে। আর বিশেষ আশা নেই। সমস্ত আশায় গ্যামাক্সিন। আত্মবিশ্বাসে তখন রিক্টার-স্কেল-এইটে-হয়ে-যাওয়া ভূমিকম্পের ফাটল। কান্না থামাতে গ্লাসে একটু জুস নিয়ে আসি। চোখের জল আর জুস দুটো মিশিয়ে জুলজুল চোখে চুকচুক করে খেয়ে নেয়। ফলের রসের স্বাত্তিক স্বাদ পেয়ে এবার ওর মেজাজ কিছুটা শরিফ। শান্ত চিত্তে চেষ্টা করে আরও চামচ দুয়েক খাইয়ে দিই। সানাইকে খাওয়াচ্ছি ভেবে দু এক চামচ নিজেকেও খাইয়ে দিই। প্লেটটা ফাঁকা হলে নিজেকেই একটা সান্ত্বনা দেওয়া যায় তাই। প্লেটটা প্রায় খালি হয়ে এসেছে। নতুন করে উৎসাহ দিই সানাইকে। "এই দেখ না, প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর এক চামচ। মুখ চালাও। অল ডান করতে হবে।" বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ে। ভাবটা যেন ওরও পুরো ভাতটা মেরে মুচড়ে ক্ষয়েয়ে নেওয়ারই ইচ্ছে। সাধ আছে অথচ সাধনা নেই! আর এক-দু চামচ আরও মিনিট কুড়ির প্রচেষ্টায় ঢুকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে নিজের খাবার গুছোই। অনেক ধকল গেছে। চাট্টি এক্সট্রা ভাত নিয়ে নিই।

আধ ঘণ্টা পরে আমার খাওয়া হওয়ার পর, খাওয়ার পরবর্তী বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়ার কাজ করার পর, যখন ওকে মুখ ধোয়াতে নিয়ে যাই দেখি মুখের মধ্যে চামচ দেড়েক ভাত এখনো জড়ো করে রাখা আছে। কি আর করা ? সেইটুকু বের করে ডাস্টবিনে ফেলে দিই। বিশেষ কিছু খাওয়াতে না পারার দোষিমন্যতা নিয়ে কটা স্ট্রবেরী অফার করি। পেট ভরে যাওয়ার দরুণ যে কিনা একটু আগে একটুও ভাত খেতে পারছিল না, সেই খুদে বুদ্ধিমান দুহাতে দুটো করে স্ট্রবেরী ফটাফট মুখে চালান দিয়ে দেয়। আড়াই মিনিটে সাড়ে তিন খানা জাম্বো স্ট্রবেরী শেষ করার পরে ওর মুখে হাসি ফোটে। ওর বাবার মুখেও।

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দুর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী

উলুখাগড়ার দিনলিপি – অন্নসংস্থানের প্রয়োজনে

পর্ব ১

[চিরকালই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সবচেয়ে বড় বলি হন উলুখাগড়ারাই। যুদ্ধে যেমন সীমান্তের আশেপাশের বাসিন্দারা। পাশের পাড়ার ছোট্টবেলার খেলার সাথীকে রাতারাতি বিদেশী তকমা লাগিয়ে নিষেধের বেড়া দিয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। বা সহস্র সম্ভাবনাময় একদল যুবককে হঠাতই মারা পড়তে হয় যারা হয়তো কেবল পরিবারকে একটু ভাল রাখবে বলে অন্য উপায় না পেয়ে সেনাবাহিনীতে কেবল চাকরি করতে এসেছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের এই দ্বিতীয় রকম উলুখাগড়ার দলেই একজন ছিলেন প্রশান্ত চ্যাটার্জী। যিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে ফিরেছিলেন। তাঁর সৈনিকজীবনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রকাশ এই উলুখাগড়ার দিনলিপি। আজ প্রথম পর্ব।]

১৯৫৯ সাল, আমি তখন ক্লাস টেন। স্কুলের ফাইনাল ইয়ার। ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না আমার। পড়াশুনা সম্পর্কে কোনোদিনই খুব একটা চিন্তা করতাম না। তার থেকে বেশি মনোযোগ ছিল ফুটবল খেলা আর নাটকের ওপর। স্কুলে পড়ার সময় প্রতি বছর রবীন্দ্রজয়ন্তীতে ওঁনার লেখা নাটক আমরা করতাম। বিসর্জন, প্রায়শ্চিত্ত, ডাকঘর আরো দু একটা নাটক করেছিলাম মনে আছে। এছাড়াও ছিল আমাদের গ্রামের শীতলা মন্দিরে যাত্রাপালা। পড়াশুনা খুব একটা করতাম না। ভাল ফল কোনো দিনই হয়নি কিন্তু কোনোদিন ফেলও করিনি। ওই বছর আবার স্কুলে ইন্টারস্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের (ISSA) ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়ে গেল। আর আমাদের পড়াশুনার বারোটা আরও বাজল। স্কুলের ফুটবল টিমে খেলার সুযোগ পেলাম। স্কুল চলাকালীনও ফুটবল প্র্যাক্টিস হোত। আবার স্কুল শেষ হতেই বইপত্তর বাড়িতে রেখে কিছু খেয়েই দৌড়তাম স্কুল গ্রাউন্ডে খেলার জন্য। সন্ধ্যা পর্যন্ত চলত প্র্যাক্টিস। দেখতে দেখতে টুর্নামেন্টের দিন এগিয়ে এলো। এলাকার বাকি স্কুলকে হারিয়ে আমরা সেমিফাইনালে উঠলাম। সামনে প্রতিপক্ষ তমলুক হ্যামিল্টন স্কুল। সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলার জন্য যেদিন তমলুক যাচ্ছি সেদিন গ্রামের কিছু মানুষ আমাদের বলেছিলেন মনে আছে, "তোরা বস্তা নিয়ে যা। গোল ভরে আনতে হবে তো ?" চিরদিনই দমিয়ে দেবার বা মনোবল ভেঙে দেবার মানুষের অভাব হয়না চারিপাশে। তবে আমরাও যে একটু ভয়ে ভয়ে ছিলাম না তা নয়। তমলুকের টিম বেশ শক্তপোক্ত। তমলুক রাজবাড়ীর মাঠে খেলা শুরুর আগে দুই দলই প্র্যাক্টিস করছি। ওদের চেহারা, পোষাক-আষাক, হাবভাব দেখে মনে আছে টেনশনে আমদের ঘন ঘন বাথরুম যেতে হচ্ছিল। খেলা আরম্ভ হলো। পাঁচ-ছয় মিনিটের মাথায় প্রথম গোল আর হাফটাইমের আগেই দ্বিতীয় গোল দিলাম আমরা। আমাদের চোখ মুখ বদলে গেছে তখন। কথার খৈ ফুটছে মুখে সবার। যারা বস্তা নিয়ে যেতে বলেছিল তাদের কয়েকজনও আমাদের সাথে গিয়েছিল। তারাও এখন অন্য কথা বলছে। সেকেন্ড হাফ শুরু হল। ওরা একটা গোল শোধ করল। উত্তরে আমরা আবার একটা গোল দিলাম। ৩-১ গোলে তমলুক হ্যামিল্টনকে হারিয়ে আমরা ফাইনালে।গ্রামে ফিরে সেদিন দেখলাম উৎসব চলছে।

কয়েকদিন পর নন্দীগ্রামের সাথে ফাইনাল খেলা। ওই তমলুক রাজবাড়ীর মাঠেই। সেদিন প্রথম থেকেই চার্জড ছিলাম আমরা। খুব ভাল হাড্ডাহাড্ডি খেলা হয়েছিল সেদিন। নন্দীগ্রামের লেফট ব্যাক বেশ লম্বা চওড়া ছিল। আমাকে যদিও সে প্রচুর মারধর করেছিল, কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। জোলো, হোসেন, দেবু, তারু এবং আমার কাছে সেদিন ওরা দাঁড়াতে পারেনি। সেবছর ISSA-র টুর্নামেন্টের ফাইনালে আমরা ২-০ গোলে জিতেছিলাম। মাস্টারমশাইদের কাছে পরে শুনেছি যে, ফুটবলে এত ভাল রেজাল্ট আমাদের স্কুল কোনোদিন করেনি।

প্রায় ষাট বছর আগেকার কথা এসব। সেই টিমের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। গোলে শ্যামল, ব্যাকে নেদা, শংকর। হাফ ব্যাকে অশোক, নাড়ু, বলাই। রাইট আউট আমি। ইন তারু, সেন্টার দেবু, লেফট ইন জোলো, লেফট আউট হোসেন

এই ছিল আমাদের টিম। শ্যামল, নাড়ু, দেবু, হোসেন এরা তো চলেই গেল ফাঁকি দিয়ে। শংকর সন্ন্যাসী হয়ে যে এখন কোথায় কে জানে। দল ভেঙে গেছে।

যাক, যা বলছিলাম। ISSA টুর্নামেন্ট শেষ হবার পর আমাদের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হলো। শেষ হবার পর, রেজাল্ট ভাল না হলেও পাশ করে যাব এমন আশা ছিল। করলামও পাশ। থার্ড ডিভিশনে। পুরো ক্লাসে একজন ফার্স্ট ডিভিশন, তিনজন সেকেন্ড ডিভিশন, আর বাকি সবাই থার্ড ডিভিশন। আমিও সেই দলে। তখন ওই রকমই রেজাল্ট হতো। দুই একজন ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করত। পরীক্ষায় পাশ করে গেছি তা সে থার্ড ডিভিশন হলেও, আর কোনো চিন্তা নেই। এবার কলেজে পড়তে যাব তাও আবার কলকাতায়। আহিরীটোলায় আমাদের একটা বাসা ছিল। ভাড়া বাড়ি আর কি। দাদারা কলকাতায় চাকরি করত আর সেখানে থাকত। যারা পড়াশুনা করত তারাও থাকত সেখানে। আমি জানতাম এবার আমায় আহিরীটোলায় থাকতে হবে। কোন কলেজ হবে কে জানে। স্কুলের গন্ডি শেষ হলেই কলেজে ভর্তি হতে হবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম বাড়িতে। কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। আমি আমার খেলা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু আমার বেলায় নিয়মটা একটু অন্যরকম হলো দেখলাম। বাবা স্কুলের মাস্টার মশাই ছিলেন। তখনকার দিনের মাস্টারমশাইদের টাকাকড়ি বিশেষ থাকত না। বাবারও স্বাভাবিক ভাবেই বিশেষ কিছু সংস্থান ছিল না। কয়েকদিন ধরেই দেখছিলাম, বাবা মায়ের মধ্যে কিছু আলোচনা চলছে। কি নিয়ে এত আলোচনা সেটা আঁচ করতে পারিনি। একদিন সন্ধ্যায় খেলে বাড়ি ফায়ার দেখলাম বাবা এবং তিন দাদা ঠাকুর দুয়ারে বসে আলোচনা করছে। আলোচনাটা আমার পড়াশুনার ব্যাপারে। দাদা তখন যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। দাদার পড়াশুনার খরচ ছোড়দা দিত সেটা আমি জানতাম। সমস্যা হলো আমার পড়াশুনার খরচ কে চালাবে সেই নিয়ে। আলোচনায় তেমন কোনো সমাধান বের হলো না। মা একটু দূরে অন্ধকারে চুপ করে বসে আছে। আমিও জানার আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি মায়ের কাছে। বাবার সেই দিনের অসহায় মুখটা আজও মনে আছে। যে বাবা মায়ের কাছে পয়সা থাকে না ছেলেকে পড়ানোর, তাদের যে কি অবস্থা হয় সেইদিন বাবাকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম। আর আমি সেইদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই অনেকটা বড় হয়ে গেলাম। একধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গেল বয়সটা। এতদিন শুধু খেলা আর নাটক নিয়েই মেতে থাকতাম। সেইদিন সন্ধ্যার ঘটনাটার পর আমার চিন্তা আরম্ভ হলো যেভাবেই হোক একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে। স্কুল ফাইনালে থার্ড ডিভিশনে পাশ করা একটা ছেলেকে কে চাকরি দেবে? সেইদিন রাত্রে বাবা ও দাদাদের সাথে একটা চুক্তি হয়েছিল, সংসার চালানোর জন্য দাদারা বাবাকে প্রত্যেকে কিছু টাকা দিত। সেই টাকায় বাবা সংসার চালাতেন। কি কষ্টে যে বাবা ওই টাকায় চালাতেন সেটা অনেক পরে জানতে পারি। সেসব কথা এখন আর লিখতে ভাল লাগছে না। মোটকথা, বাবার দাদাদের সাথে কথা হয়েছিল এরকম যে, আমার কলেজের মাহিনা, আমার হাত খরচ বাদ দিয়ে যেন বাবাকে টাকা দেওয়া হয়। বাবা যে ভাবেই হোক সংসার চালাবেন। সেটা বাবার দায়িত্ব। সব দাদারা কলকাতায় বাসায় থাকত, তাদের সাথে আমিও থাকব। চলে যাবে এক খরচে। এইভাবে আমার সংস্থানহীন বাবা তাঁর ছোট ছেলের কলেজে যাবার একটা ব্যবস্থা কোনো ক্রমে করতে পারলেন। আমাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে কমার্সে ভর্তি করে দেওয়া হল। তখন কলেজে ভর্তি হওয়া অনেক সহজ ছিল। থার্ড ডিভিশনে পাশ করেও কত সহজে কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। কলেজের মাহিনা ছিল আট টাকা। আর আমার সারা মাসের হাত খরচ ছিল আট টাকা। মানে প্রতিদিন চার আনা। সেই চার আনায় বিকেলের টিফিনের খরচও ধরা আছে। খেলার নেশা ছিল। মাঝে মাঝে কলেজ কামাই করে ময়দানে খেলা দেখতে চলে যেতাম। ট্রামের ভাড়া থাকত না সবসময় সাথে। ভাড়া না দিয়ে ট্রাম বদলে বদলে চলে যেতাম ময়দানে খেলা দেখতে। এরমধ্যে আবার একটা সমস্যা তৈরী হলো। আমার কোনো ফুলপ্যান্ট ছিল না। হাফপ্যান্ট পরে কলেজে যাবার জন্য শহরের ছেলেরা বিদ্রূপ করতে ছাড়তো না। বাধ্য হয়েই দাদাদের বললাম ব্যাপারটা। বড়দা নিজের একটা পুরোনো প্যান্ট কাটিয়ে আমায় দিল সাথে একটা নতুন প্যান্ট। ওই দুটো প্যান্টে আমার কলেজ চলে যাচ্ছিল। বাবার সাথে চুক্তি অনুসারে, সেজদা কলেজের মাহিনা এবং হাত খরচের মোট ষোলো টাকা সারা মাসের জন্য আমায় দিয়ে দিত। আহিরীটোলায় মাঝে মধ্যে ছোড়দার বন্ধু সলিলদার কাছে যেতাম। বুক কিপিংটা উনি দেখিয়ে দিতেন। কলেজের প্রথম বছরটা এই ভাবেই দেখতে দেখতে কেটে যাচ্ছিল। বেশ চলছিল, হঠাৎ

করেই আমার কলেজের মাহিনা দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সেজদাকে কয়েকবার বলতে সেজদা বললে, ফাইনাল পরীক্ষার আগেই দিয়ে দেবে, কোনো অসুবিধা হবে না। ব্যাপারটা বাবাকে বলা হয়ত উচিত ছিল আমার। কিন্তু আমি তখন কিছুই জানালাম না। দেখতে দেখতে সেকেন্ড ইয়ারের টেস্ট পরীক্ষা এসে গেল। পরীক্ষা দিলাম। রেজাল্টও বের হলো। এইবার একটা ঘটনা ঘটে গেল যেটা হয়ত আমার সেনা বাহিনীতে যোগ দেবার একটা অন্যতম মুখ্য কারণ। সেকেন্ড ইয়ারের রেজাল্টের দুটি লিস্টে আমার নাম আছে। একটা পাশ লিস্ট। অর্থাৎ আমায় টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করেছি। ফাইনাল পরীক্ষার জন্য কোয়ালিফায়েড। আর অপর লিস্টটি হলো, ডিসকলেজিয়েটদের লিস্ট। পুরো মাহিনা না দিয়ে থাকার জন্য হাজিরা খাতায় আমার নাম ছিল না। ফলে আমার হাজিরা শতকরা ষাট শতাংশের কম। তাই আমি টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করলেও ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারব না। দাদাদের বললাম সবটা। সেসময় সেজদা এবং তার একজন বন্ধু কলেজে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই বছরের জন্য হাজিরার পার্সেন্টেজের লিষ্ট ততক্ষণে পৌঁছে গেছে ইউনিভার্সিটিতে। সুতরাং অনেক চেষ্টা করেও সেবছর আমার আর ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া হলো না টেষ্ট পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করা স্বত্বেও। পরীক্ষাই যদি সেবছর না দিতে পারি, তাহলে আর আহিরীটোলায় থেকে কি করব ? বাড়ি ফিরে এলাম। বাবাকে বললাম সবকিছু। বাবা বললেন ওঁনাকে আমার আগেই জানানো উচিৎ ছিল। ১৯৬১ সালে আমার আই. কম. পরীক্ষা দেওয়া হলো না। গ্রামে এসে আবার সেই ফুটবল, নাটক। শীতলা মন্দিরের কাছে একটা নাটক করেছিলাম সেবছর মনে আছে। নাম মনে হয়, 'বৌদির বিয়ে।'

বাবা আবার দাদাদের সাথে কথা বললেন কিছু একটা করার জন্য। আমায় আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলকাতার বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো। আর টাইপ রাইটিং আর কম্পটোমিটারে ভর্তি করে দেওয়া হলো। সারা দিনে দু ঘন্টার ব্যাপার। বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াকালীন আহিরীটোলা থেকে হেঁটেই যাতায়াত করতাম। এখনও টাইপ রাইটিং এর জন্য নতুনবাজার পর্যন্ত হেঁটেই যাতায়াত করতাম। ইতিমধ্যে একদিন ময়দানে একটা ভাল খেলা থাকায় একদিন কিছু দৈনিক পারিবারিক ডিউটি ভুলে চলে গেছিলাম ময়দানে খেলা দেখতে। তার ফলশ্রুতিতে এমন কিছু ঘটনা ঘটল, যে আমি কোনো ক্রমে রাতটুকু কাটিয়ে আবার গ্রামে ফিরে এলাম। এবং মা-বাবাকে পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলাম, কোনো অবস্থাতেই আমি আর আহিরীটোলায় ফিরে যাব না। সেসব কথা সবিস্তারে লেখার কোনো প্রাসঙ্গিকতা আজ আর নেই। গ্রামে আগের মতোই সবকিছু চলছিল, সাথে সাথে চলছিল প্রাইভেটে আই. কম. পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতি। কলকাতার কোনো কলেজ থেকে পরীক্ষা দেব না ঠিক করে নিয়েছিলাম। ছোড়দি প্রাইভেটে আই.এ. পরীক্ষা দেবে ঠিক করেছিল, আমিও তার সাথে এক্সটার্নাল ছাত্র হিসেবে তমলুক কলেজ থেকে আই.কম. পরীক্ষা দেব ঠিক হলো। তমলুকে মেজদির বাড়ি থেকে সেইমত পরীক্ষা দিলাম। পাশও করে গেলাম বিনা বাধায়। কলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে বি.কম. পড়া আর হলো না। ঠিকই করে নিয়েছিলাম, আর পড়াশুনা নয়। চাকরি আমার একটা চাইই। বাবাকে আমায় সাহায্য করতেই হবে।

সেই সময় পুলিশ কমিশনার ছিলেন হরিসাধন ঘোষচৌধুরী। উনি আদতে আমাদের গ্রামের লোক। আর বাবার খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। একদিন বাবাকে বুঝিয়ে নিয়ে গেলাম নিউআলিপুরে ওঁনার তখনকার বাড়িতে। সেইসময় শিক্ষক আর ছাত্রের সম্পর্ক কেমন ছিল তার প্রমাণ বেশ কয়েকবার পেয়েছি। মা একবার বাবাকে বলেছিল যে, মা বাবার সাথে আর কোনোদিন বাইরে যাবে না। বাবার অনেক বয়স্ক, সম্মানীয় প্রাক্তন ছাত্র রাস্তায় বাবার সাথে দেখা হলে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। স্বাভাবিক ভাবেই মা সাথে থাকলে মাকেও প্রণাম করতেন। তাতে মায়ের খুব লজ্জা করত। যাই হোক, হরিসাধন ঘোষচৌধুরীর বাড়িতে পৌঁছানোর পর, তিনি বাবাকে ফল মিষ্টি দিয়ে অনেক আপ্যায়ন করলেন। বাবা এক সময় বললেন, ছেলেটা এবার আই. কম. পাশ করেছে। কিন্তু এটা বললেন না যে, ছেলেটার একটা চাকরির দরকার আর তার জন্যই তাঁর সেইদিন সেখানে আসা। আমি আই. কম. পাশ করেছি শুনে উনি বললেন, "খুব ভাল কথা। এইবার বি.কম.-এ ভর্তি করে দিন।" ওঁনার মাষ্টার মশাইয়ের সমস্যার কথা উনি বুঝতে পারলেন না। আর শ্রদ্ধেয় শিক্ষকও ছাত্রের কাছে সমস্যাটা খুলে বলতে পারলেন না। আমি শুধুই শ্রোতা এবং দর্শক সেই কথোপকথনের। ঘোষচৌধুরীর বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে সেদিন মনে আছে বাবার সাথে আমি অনেক রাগারাগি করেছিলাম। "আপনি (বাবাকে আমরা 'আপনি'

বলতাম) যদি চাকরির কথা নাই বলবেন তবে এত পয়সা খরচ করে, এত কষ্ট করে এখানে এলেন কেন ?" বাবা বললেন, "কেন জানি না, আমি বলতে পারলাম না যে, আমার ছেলের একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও।" যদিও তখন আমি রাগারাগি করেছিলাম কিন্তু এখন বুঝতে পারি, তখনকার অনেক মানুষের মধ্যেই সেই অবিশ্বাস্য রকম এক মূল্যবোধ ছিল, যাতে তাঁরা নিজের জন্য কিছু চাইতে পারতেন না। বাবা যদি সেইদিন ঘোষচৌধুরীকে একবার বলতেন, আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা উনি করতেনই। কিন্তু শতপ্রয়োজন থাকা স্বত্বেও বাবা যে তাঁর ছাত্রের কাছে সেদিন মাথা নিচু করেন নি সেজন্য সেদিন না বুঝলেও আজ আমি গর্ব বোধ করি। এছাড়াও মিলিটারি চাকরি করে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সে অভিজ্ঞতা আমার হতো না সেদিন বাবা যদি আমার হয়ে দরবার করতেন।

আরো নানা ভাবে নানান চেনা জানা লোকজনকে বলেও কোনো রকম সুরাহা হলো না। কেবল আজ নয় কাল করে সময় নষ্ট। যেরকম হয় আর কি। একজন তো বাড়ির রাধুঁনীকে কে দিয়ে মিথ্যে বলিয়ে প্রায় ভাগিয়েই দিল। যাক গে সেসব কথা। আসলে চড় মারলে বেশিদিন তা মনে না থাকলেও, চড় খেলে অনেকদিন তা মনে থাকে।

কোন ভাবেই অনেক চেষ্টা করেও কোন একটা চাকরি পাওয়া গেল না। খুব হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। মানসিক অশান্তিতে ছিলাম। Employment Exchange-এ নাম লেখানো ছিল। হঠাৎই একদিন একটা চিঠি এল সেখান থেকে। জানিয়েছিল অমুক তারিখের মধ্যে সব কাগজপত্র নিয়ে ওদের ওখানে হাজির হতে হবে। কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিস ছিল। খবরটা পেয়ে খুব আনন্দ হয়েছিল। ঠিক সময়ে কাগজপত্র নিয়ে ওই অফিসে চলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত বেকার যুবকই যেন ওখানে পৌঁছে গেছে। কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকার পর জানা গেল এটা মিলিটারিতে ভর্তি হবার জন্য ডাকা হয়েছে। একটু দ্বিধায় পড়লাম, মিলিটারিতে যাব ? সেই সবে ১৯৬২ সালের চীন ভারত যুদ্ধ শেষ হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও তো কোন জায়গায় কিছু পেলাম না। তখন মনে মনে ঠিক করে নিলাম যে ঠিক আছে মিলিটারিতেই না হয় চলে যাব। যারা ইচ্ছুক তাদের সাথে আমিও কাগজপত্র নিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। বাড়িতে কেউ জানে না এটা মিলিটারি চাকরির ব্যাপার। প্রথমে ওজন, দৈর্ঘ্য ও অন্যান্য শারীরিক পরীক্ষা করে, যাদের শরীর ঠিক আছে তাদের একটা কাগজ দিয়ে দিল। বাড়িতে এসে কাউকে আর বললাম না এটা মিলিটারি চাকরির ব্যাপার। পুরোটা গোপন করে রেখে বললাম, কালকে আবার যেতে বলেছে। আমাদের বলা হয়েছিল, আগামীকাল ফোর্ট উইলিয়াম গেটে সকাল আটটায় রিপোর্ট করতে হবে। বাসাতে ফোর্ট উইলিয়ামের কথাটা ইচ্ছে করেই বলিনি। সে যাই হোক, সেইদিন গেলাম সকাল আটটায়, আবার নানা রকম পরীক্ষা হল। ততক্ষণে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি মিলিটারিতে চলে যাব। দৌড় ও আরও নানারকম পরীক্ষা করে যারা পাশ করল তাদের একটা কাগজ দিল প্রমাণপত্র হিসাবে। আমাকে যে কাগজ দিল তাতে জব্বলপুর যেতে হবে জানিয়েছে। এবং জানিয়েছে আজই সন্ধ্যে আটটাতে বম্বে মেলে যেতে হবে। আমি ওঁনাদের অনুরোধ করলাম আজ বাবা মায়ের সাথে দেখা করে আগামীকাল যাব। আমাকে বলেছিল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে বেলা বারোটায় যেন রিপোর্ট করি। বাসা থেকে নিজের জামা, প্যান্ট ও হালকা বিছানা নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। আসার আগে বাসাতে গিয়ে দাদাকে সব সত্যি কথা বললাম। গ্রামের বাড়িতে এসে বাবা মাকেও বললাম সব কিছু। মা একটা কথাও বলেনি সেদিন। বাবা বলেছিলেন, যাবার আগে একটু আলোচনা করলে ভালো করতে। তখন আর কিছু করার নেই। সেই রাত্রে দেবুর সঙ্গে দেখা করে তাকে সব বললাম। বাড়ি আসার পর দেখলাম, বাবা মা একেবারে চুপ হয়ে গেছেন। মা এবারে কান্নাকাটি করছে। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম এত চেষ্টা করেও তো কোন চাকরি পেলাম না – এত ছেলে যাচ্ছে, আমিও যাব – অসুবিধা কোথায়।

পরের দিন যথাসময়ে বাবা মা-কে প্রণাম করে, ওঁনাদের আশীর্বাদ নিয়ে কলকাতায় যাবার জন্য বেরিয়ে গেলাম। এমপ্লয়মেট এক্সচেঞ্জে যথাসময়ে রিপোর্ট করলাম। আমাদের সব কাগজপত্র তৈরী হল। আমাকে জব্বলপুর যেতে হবে। ট্রেন ওই রাত্রি আটটায় বম্বে মেল। মিলিটারিতে সিগনালিং কর্পস আছে, যাদের উপর আর্মির সব যোগাযোগের দ্বায়িত্ব। আমাকে R.M. ev Radio Mechanic-এর কাজ দেওয়া হয়েছিল। আমার সাথে রামধারীলাল বলে একটি বিহারী ছেলে

ছিল। তাকে দেওয়া হয়েছিল Wireless Operator - এর দায়িত্ব। ওখান থেকে ঠিক সময়ে মিলিটারি গাড়ি করে আমাদের হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছে দিল। তার আগে কটা টাকা আমাদের দেওয়া হয়েছিল, টাকার অংকটা আজ আর মনে নেই। বম্বে মেলে মিলিটারি কামরায় আমাদের তুলে দেওয়া হল। হাতে আমাদের জব্বলপুর পর্যন্ত ট্রেনের টিকিট। ট্রেন ছাড়ার পর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বার বার বাবা মা-র কথা মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কাজটা কি ঠিক করলাম!

এরকম করেই কেবলমাত্র রুটিরুজির প্রয়োজনেই কি দিনের পর দিন শয়ে শয়ে যুবকরা অনেক সম্ভাবনা ছেড়ে, স্বপ্ন ছেড়ে সেনাদলে নাম লেখায় ? দেশপ্রেম না খিদে কোনটা জিতে যায় সেনাবাহিনীর কঠিন বাস্তবতাকে হারিয়ে দিয়ে ? ১৯৬২ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আমার ক্ষেত্রে খিদেটাই জিতে গিয়েছিল।

(চলবে)

Prasanta Chatterjee — 76 years. Retired from Indian army on 1978. Later worked at Indian postal service. Retired on 2001. Passionate footballer. Played for Indian army team. Stays at Gopalnagar, Kolaghat, East Midnapore, West Bengal, India.

মৌসুমী রায়

বেনারসের ডায়রি

(১)

বেনারস নামটার মধ্যেই কেমন একটা শিহরণ আছে মশাই... ভাবলেই কেমন যেন রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি ! তা, আমরা কি বেনারস যাচ্ছি নাকি ?

আলবাত যাচ্ছি... এখুনি টিকিট কেটে নিতে হবে... আর তো মাত্র কটা দিন হাতে...!

নাহ... এটা কোনও ফেলু মিত্তির আর জটায়ুর কথোপকথনের অংশ নয়। তবে বেনারসের নামেই আমরা বাঙালিরা সবাই কেমন নস্টালজিক হয়ে পড়ি। কেমন যেন রহস্য রোমাঞ্চের গন্ধ পাই। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মগনলাল মেঘরাজের বজরা, ডেরায় তার আতিথেয়তায় জটায়ুর করুণ অবস্থা, অলিগলি ভরা বেনারসের এক খন্ড চিত্র, যা সেই ছোট্ট বেলা থেকে আমাদের মনের ভেতর গেঁথে আছে। তাই হঠাৎ বেনারস যাবার প্ল্যান হতেই ঠিক যেন ওমনটিই মনে হচ্ছিল ভেতর ভেতর। বেশ একটা ছটফটানি। সামনেই মেয়ের বিয়ে। তাই পুজো দেওয়া মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও আর এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিলো। কেনাকাটা, – বলাই বাহুল্য।

চলেছি বেনারস অভিযানে আমরা পাঁচ জন, "টিম লাদাখ"। এটা আমার চতুর্থ বার বেনারস যাত্রা। নানা ছোটখাটো নানা স্মৃতি উঁকি দিচ্ছে মনের ভেতর। আমার মেয়ে আর সঙ্গী মিষ্টি দম্পতিটি নতুন শহর দেখার আনন্দে বেশ উত্তেজিত। হাওড়া থেকে রাতের বম্বে মেলে রওনা দিয়ে সকাল আটটা নাগাদ মোঘলসরাই। সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে বেনারস পৌঁছতে পৌঁছতে আরও প্রায় ঘন্টা খানেক। যেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সেটি বেনারসের প্রাণকেন্দ্র গোধূলিয়া মোড় থেকে প্রায় দু কিমি দূরে। মেন রোড থেকে পাথুরে সরু গলি ঢুকে গেছে ভেতরে। দুবার মোড় ঘুরতেই আমাদের হোটেল রিভেরা প্যালেস। হোটেলে ঢুকেই দিল খুশ। আধুনিকতা আর রাজকীয়তার মেলবন্ধনে মুগ্ধ সবাই।

(২)

বেনারস... উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ পূর্বে বিহারের গা ঘেঁষা গঙ্গার তীর বরাবর গড়ে ওঠা দেশের অন্যতম প্রাচীন একটি শহর। বাবা বিশ্বনাথের মন্দির এখানকার প্রধান আকর্ষণ। এছাড়াও মন ভোলানো বেনারসী পান, বাহারি পানমশলা, রাবড়ি, পেঁড়া, মালাই সহযোগে ঠান্ডাই বা লস্যি আর সর্বোপরি বেনারসী শাড়ির একটা জবরদস্ত প্যাকেজ... যা এই স্থানের একান্ত নিজস্ব ঐতিহ্য। নামের সাথেই জড়িয়ে আছে এক বনেদিয়ানা।

প্রথম দিন লাঞ্চ সেরে একটু বিশ্রাম নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম এদিক ওদিক একটু ঘুরে দেখতে। গলি থেকে বেরিয়েই মেন রোড। অহরহ অটো টোটোর চলাচল। একটায় উঠে পড়লাম। উদ্দেশ্য কেদার ঘাট। ওটাই আমাদের হোটেলের সবচেয়ে কাছের গঙ্গার ঘাট। জনপ্রতি যা ভাড়া, তার দ্বিগুন দিতে হলো। সৌজন্যে শ্রাবণ মাস। ভক্তের ভিড়ে রমরমা শহর। অগত্যা রাজি না হয়ে উপায় নেই। যাকে বলে একেবারে ফুল সিজন্।

মিনিট পাঁচেক গিয়েই যেখানে নামিয়ে দিলো, জায়গাটা বাজার এলাকা। ভিড়ে ঠাসা। তার ভেতর দিয়ে গলির গলি তস্য গলি। কয়েক গজ এগোতেই একজন ঘাটের দিকটা ঈশারায় দেখিয়ে দিল। কিন্তু ঘাট কই! সামনেই লাল রঙের একটা বিশাল তোরণ। সেখানে উঁকি মেরে দূরে এক চিলতে গঙ্গার দেখা মিললো। এক ভাঁড় ঘন দুধ চা খেয়ে তোরণের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলাম। দুধারে গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসীরা সারি দিয়ে বসে। ছবি তুলছি অথচ টাকা পয়সা কিছু দিচ্ছিনা দেখে বেশ বিরক্ত। মনে মনে অভিসম্পাত করছিলো কিনা কে জানে! সরু লম্বা টানেলাকৃতি রাস্তাটা পেরিয়ে ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে গঙ্গা সেখান থেকে বেশ অনেকটা নীচে। সরু সিঁড়ি নেমে গেছে জল পর্যন্ত। ঘাটের জেটির কাছে সার বাঁধা নৌকো । শুনলাম এখান থেকে ফেরি সার্ভিসে বিভিন্ন ঘাট ঘুরে দেখানোর ব্যবস্থা আছে। বেনারসের দক্ষিণে বিজয়নগরের রাজা এই ঘাট নির্মাণ করেন। শিবের নামে (কেদারনাথ) এই ঘাটের নাম রাখা হয় কেদার ঘাট। ঘাটের গঠনগত সৌন্দর্য চোখে পড়ার মতো। কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকলাম। এর ঠিক পাশেই হরিশচন্দ্র ঘাট। জ্বলন্ত চিতার আগুন বুঝিয়ে দিচ্ছে শবদাহ চলছে। কথিত আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র কিছু দিন এখানে ডোমের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলো গঙ্গার বুকে। ঘন নীল অন্ধকারে ছেয়ে গেল আশপাশ। আলো জ্বলে উঠলো লাল রঙা উঁচু প্রাসাদোপম ঘাটের তোরণে। আমরাও উঠে পড়লাম। উদ্দেশ্য বাবা বিশ্বনাথের মন্দির দর্শন।

(৩)

কাশিতে আমাদের আজ প্রথম সন্ধ্যে। গঙ্গারতির সুসজ্জিত প্রদীপগুলো জলের তালে দুলে দুলে চলেছে। আমরা উঠে পড়লাম গঙ্গার ঘাট থেকে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে ঘন অন্ধকারে এক ঝাঁক জোনাকি যেন গঙ্গার গতিপথ আঁকছে। কেদার ঘাট থেকে বেরিয়ে গলির পাকদণ্ডি ঘুরে পৌঁছলাম বড় রাস্তায়। একটা টোটো ধরে সোজা গোধূলিয়া মোড়। বেনারসের প্রাণ কেন্দ্র। মানুষ আর গাড়ির ভিড়ে জমজমাট। একটা লম্বা মিনারকে কেন্দ্র করে চারদিকে চারটি রাস্তা চলে গেছে। ওখানে এক লম্বা জটাধারী বিদেশী ফটোগ্রাফার বিশাল একটি ক্যামেরায় ইয়া বড়ো বড়ো লেন্স লাগিয়ে ছবি তুলে চলেছে। এই চার মাথার মোড় থেকে যে রাস্তাটা বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে চলে গেছে তারই শেষ অংশ গিয়ে মিশেছে দশাশ্বমেধ ঘাটে ।টোটো থেকে নেমে আমরা মন্দিরের রাস্তা ধরলাম। বাঁশের ব্যারিকেড করে যাওয়া আসার রাস্তা ভাগ করা, শেষ শ্রাবণের জনজোয়ার সামলাতে। দুধারে জমজমাট বাজার। বাহারি বেনারসী পান থেকে বেনারসী শাড়ি সব মিলবে এখানে। চলতি পথে এমন সুন্দর রঙবেরঙের নয়নাভিরাম শাড়ি হাঁটার গতিকে বাধা দিচ্ছে বারবার ।

(৪)

গোধূলিয়া মোড় থেকে কিছুটা এগিয়ে বাঁ হাতে বাবা বিশ্বনাথের গলি। সুন্দর পাথরে বাঁধানো রাস্তা। দু-দিকে সারি সারি দোকান। আলো আর রঙের ছটায় উজ্জ্বল সে পথ। প্রায় ত্রিশ বছর আগের স্মৃতির সাথে মেলানো বেশ কঠিন। ইতি উতি বিশাল দেহী ষাঁড়ের দেখা নেই। যত্রতত্র গোবিষ্ঠায় পা পেছলানোর ভয় নেই। স্বচ্ছ ভারত মিশনের এফেক্টে সব

ঝকঝকে তকতকে। গলিতে বাঙালি ট্যুরিস্ট দেখে হাসি হাসি মুখে হিন্দিতে বা আধো বাংলাতে দোকানদারদের ডাকাডাকি। সেসব উপেক্ষা করেই এগোতে লাগলাম মন্দিরের দিকে। না চাইলেও চোখ চলে যাচ্ছে বারবার। গলির শেষ প্রান্তে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির। মন্দির ঘিরে রাজ্য পুলিশের সুরক্ষা বলয়। মন্দির সংলগ্ন একটি দোকান থেকে পুজা উপাচার নিয়ে আমরা চারজন মন্দিরের ১ নম্বর গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সকলের ব্যাগ ফোন আর জুতোর দায়িত্ব সামলাতে পতিদেব বাইরেই থেকে গেলেন।

(৫)

কিছুটা সরু আধো অন্ধকার রাস্তা পেরিয়ে মন্দির প্রকোষ্ঠ। কয়েক ধাপ সিকিউরিটি চেকের পর মন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র মিললো। ভেতরে ঢুকতে যাব কোথা থেকে একটা আকন্দের মালা এসে পড়লো মেয়ের গলায়। অব্যর্থ টিপ। অতর্কিত এই ঘটনায় মেয়ে আর আমি বেশ ঘাবড়েই গেছি। ভাবছি নিশ্চয়ই বেটারা টাকাপয়সা কিছু চাইবে। ঘুরে বলতে যাব দেখি একজন গেরুয়া বসনধারী, যার হাত থেকে মালাটি উড়ে এসেছে আমায় হাত জোড় করে অভয় দিলেন। বললেন... "ইয়ে বেটিকি মঙ্গল কে লিয়ে হ্যায়... বাবা কা আশীর্বাদ সামঝো... ঘাবড়াও মাত..."। একটু আশ্বস্ত হয়ে এগোতে যাব আবার আরেকটা। এবার নিপুন হাতের টিপে আমার গলায়। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো।

জয় বাবা কাশীনাথের জয়

জয় বাবা বিশ্বনাথের জয়

তখন রাত প্রায় আটটা। মন্দিরে এ সময়ে ভিড় একটু হাল্কা। তাই খুব বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না। চার জনেই সুষ্ঠু ভাবে বাবার মাথায় জল ঢাললাম। দর্শনও করলাম সামনে থেকে। স্পর্শ করে প্রণাম সারলাম নির্বিঘ্নেই। নাম গোত্র সহকারে পুজো দিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করে ঘুরতি পথে মন্দিরের পেছনের রাস্তা দিয়ে বাইরে এলাম। মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করে এক নম্বর গেটে যাব যেখান থেকে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু গলির নানা ভাঁজে রাস্তা কেমন গুলিয়ে গেলো। গোলোক ধাঁধায় মনে হচ্ছে বুঝিবা হারিয়েই গেলাম। সাথে ফোনটাও নেই। গলির এদিকটা বেশ অন্ধকার। বাবা বিশ্বনাথের গলি তো না যেন মগনলাল মেঘরাজের ডেরায় ঢুকে পড়েছি। সার্কাসের বৃদ্ধ জাগলার অর্জুনের অব্যর্থ নিশানায় স্বাগত জানানোর অভিজ্ঞতা আগেই হয়েছে। শুধু ধারালো ছুরির বদলে এক্ষেত্রে আকন্দ ফুলের মালা। কৈশোরের ঘোরে আচ্ছন্ন মন যেন সত্যি খুঁজে পেতে চাইছে সেই সব চরিত্রদের। আমাদের চার জনের টিম এর একমাত্র পুরুষ, কীর্তি অভয় দিয়ে আগে আগে চলেছে। হঠাৎ দূরে উজ্জ্বল আলোর রেখা। বেশ আশ্বস্ত লাগলো। কাছে আসতে বুঝলাম ঠিক পথেই এসেছি।

বাবা বিশ্বনাথের গলি

(৬)

নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে যে যার মুঠোফোন হস্তগত করে বাবা বিশ্বনাথের গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এলাম। ইচ্ছে ছিলো আজই একবার দশাশ্বমেধ ঘাট ঘুরে আসবো। কিন্তু অনেকটাই রাত হয়ে গেছে। তাই সে ইচ্ছায় আপাততঃ লাগাম টানতে হলো। এত হাঁটাহাঁটিতে বেশ গরমও লাগছে।

গোধূলিয়া মোড়ে এসে মালাই সহযোগে এক এক গ্লাস ঠান্ডাই খেয়ে শরীর মন দুইই ঠান্ডা হলো। বানানোর পদ্ধতিটাও খাসা। এবার হোটেলে ফেরার পালা। বেশ ক্লান্ত লাগছে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকির মাঝে একটা টোটোতে উঠে বসলাম। গন্তব্য রিভেরা প্যালেস। ঘড়িতে তখন রাত দশটা ছুঁই ছুঁই।

(চলবে)

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর লাদাখ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

MÚSICAS
MÚSICAS
MÚSICAS
MÚSICAS

Rohini
Nandi